অন্বেষা

নববর্ষ সংখ্যা

১৪২৯

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক ডিজিটাল পত্রিকা

অন্বেষা

নববর্ষ সংখ্যা

১৪২৯

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক ডিজিটাল পত্রিকা

সম্পাদনা

সুধাংশু শেখর পাল

ও

অশোক বিশ্বাস

প্রকাশক

এরিকেয়ার

কেন্দ্রীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সংগঠন

সি-৪৩, নিউ গড়িয়া ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি, কলকাতা - ৭০০০৯৪

ওয়েবসাইট : http://aricare.in/index.php

ই-মেইল : aricarekolkata@gmail.com; info@aricare.in

দূরাভাষ : ৯১৯৪৩২২০৯৮৫, ৯৮৩০০৪৪১১০, ৯৪৩২০১২৪৬৬

মুদ্রক: মৌসুমী মুখার্জী

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

এবারের পয়লা বৈশাখ এল নতুন ভাইরাস ঘটিত মহামারীর তৃতীয় ঢেউয়ের শেষে। জীবিকার সংকটে পড়েছেন বিপুল সংখ্যক নিম্ন আয়ের মানুষ। তবুও পয়লা বৈশাখ আসে নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন, নতুন প্রত্যয় নিয়ে। ১৪২৯ বঙ্গাব্দের প্রথম থেকে আমরাও নতুন আশা ও স্বপ্ন মনে প্রাণে ধারণ করে এগিয়ে যাবো। বৈশাখে নববর্ষের আবাহন ও উৎসব কেবল বাংলায় নয়, আসামে বিহু উৎসব, শিখদের বৈশাখী, বৌদ্ধদের বৈশাখী পূর্ণিমা তাও এই বৈশাখে। 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো / মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা / অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা' - কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গান গেয়ে আপামর বাঙালি আবাহন করে নতুন বছরকে।

বর্ষবরণ বাঙালির সর্বজনীন উৎসব, আবহমানকাল ধরে বাংলার গ্রাম-গঞ্জে, আনাচে-কানাচে এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে। গ্রামীণ মেলা, হালখাতা, বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলার আয়োজন বর্ষবরণের মূল অনুসঙ্গ। আগের বছরের দেনা-পাওনা আদায়ের জন্য ব্যবসায়ীরা আয়োজন করেন হালখাতা উৎসবের। গৃহস্থ বাড়িতে রান্না হয় উন্নতমানের খাবার ও মিষ্টান্ন। বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গ হিসাবে নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসব।

বাংলা সাহিত্য চর্চাও নববর্ষ উদযাপনের অঙ্গ। উৎসবের উপাচার হিসাবে কেন্দ্রীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সংগঠনের মুখপত্র 'অন্বেষা' বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ সংখ্যা প্রকাশের মধ্য দিয়ে অংশ হতে চায় সেই উদযাপনের। বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে গবেষণামূলক অনুসন্ধান কাজের সাথে সাথে সাহিত্য নিয়ে চর্চা করে আসছেন অনেক অবসরপ্রাপ্ত বন্ধুরা। এই সংখ্যায় আমাদের বন্ধুদের বিভিন্ন বিষয়ে ও ভাবনায় লেখা কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদির সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক মূল্য রয়েছে। আশাকরি আগামী দিনে আমাদের অবসরপ্রাপ্ত বন্ধুরা নিজেদের প্রতিভা দিয়ে আরো সুন্দর সুন্দর আলেখ সহকারে আমাদের পত্রিকা সমৃদ্ধ করে তুলবেন। সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই ও সবার সুস্থতা কামনা করি।

সূচি

- **কবিতা** ৫ - ১১

  মুক্তি সাধন বসু , সুধাংশু শেখর পাল, লীলাময় পাত্র, অশোক মজুমদার, ও বংশী মন্ডল

- **গল্প** ১২ - ৩১

  অশোক বিশ্বাস , গৌতম রায়

- **প্রবন্ধ** ৩২ - ৫২

  প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, রজত তরাত, মৃন্ময় দত্ত, সুভাষ চন্দ্র সাহা, সত্যব্রত মাইতি ও তনুরূপা কুন্ডু

- **ভ্রমণ কাহিনী** ৫৩ - ৬৬

  কৃষ্ণ কিশোর শতপথী, তনুরূপা কুন্ডু ও দিলীপ কুন্ডু এবং উৎপলা পার্থসারথি

সম্পর্ক

ড: মুক্তি সাধন বসু

দুজনের পৃথিবীর পরিধি জানিনা,

দূরত্ব মাপিনি মাটি থেকে মহাকাশ,

গভীরতা সমুদ্রের আকাশের নীলে,

কলঙ্ক কবরে শুয়ে, মাপিনি কালিমা,

দ্রৌপদীর লজ্জাবস্ত্রে গ্লানির ঘনত্ব।

সম্পর্ক জানিনা শিকড়ে মাটির,

শুনিনি সংলাপ তুষারে শিশিরে,

অন্তরঙ্গ তরঙ্গের ঘনিষ্টতা তটে,

নাড়ীতে নক্ষত্রে, গ্রহণে গঙ্গা স্নানে,

আলো অন্ধকারে জোয়ারে ভাঁটাতে।

শুধু জানি আকাশ মাটির কানাকানি,

দিন শেষে দিগন্ত রেখায় একান্ত সংলাপ।

অভিমানী ভালোবাসা ভাব বিনিময়,

মেঘের আঁচলে বাঁধা দিনান্তের সুখ,

মাটিতে রাত্রিবাস তারার বাসরে।

শতাব্দীর শাশ্বত সূর্য অস্বস্তিতে জানি,

ক্রমাগত গভীরতা বাড়ে কৃষ্ণ গহ্বরে,

কুমেরুর আস্ফালন তুষার ঝড়ের,

পাহাড়ে সংঘাত দ্রাঘিমার দীর্ঘ ফাটল

সুমেরুতে শ্বলোদ্বাস গঙ্গায় প্লাবন।

কালের গহ্বরে মহাকাল, এ কোন সকাল।

দৌড়

ডঃ সুধাংশু শেখর পাল

জ্বলন্ত উনুনের আঁচে লোহার কড়াইতে,

কি দৌড় দৌড়োচ্ছে মক্কার দানাগুলি,

আর ফট-ফট শব্দে ফেটে যাচ্ছে।

সহিসের চাবুক খেয়ে ঘোড়াগুলি যেমন দৌড়ায়,

হয় তো অলিম্পিক এ সোনা জেতার প্রস্তুতি।

জানে কি তাহারা কি তাদের নিয়তি?

তবু দৌড়ে চলে এক অজানা লক্ষ্যে।

দৌড়ে দৌড়ে কি হাল হয়েছে জীবগুলির,

মুখে গ্যাঁজা, ক্ষত-বিক্ষত খুর নিয়ে দিচ্ছে দৌড়,

নুয়ে গেলো শরীর, আবছা হলো দৃষ্টি,

সয়েছে দেদার ঝড়, বাদল আর বৃষ্টি।

প্রতিস্পর্ধার দৌড় - থামার নাম নেই,

সেই মান্ধাতার যুগ থেকে ,

দিন রাত এক হয়, ঘুম আসে না চোখে।

যশ, প্রতিপত্তি, অর্থ আর ক্ষমতা,

এর মধ্যে অবান্তর নয় কি সমতা?

বড় লোভ, অসীম আগ্রহ, দৌড়ে এলাম মঙ্গল গ্রহে,

দেখতে হবে কি আছে সেখানে?

দৌড়ে এসো, প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে বিগ্রহে,

মায়ের বুকে বড় মমতা,

বাছারা শুধু-শুধু দৌড়ে মরে,

ধূলি-ধূসরিত পৃথিবীতে কি কেবলই ঘাম ঝরে?

The Mysterious Mind

Dr. Sudhansu Sekhar Pal

Mind, you are very, very kind,

Seated in every heart's core,

The invisible entity,

So fragile and easy to tore.

Mind, you don't mind,

You are very restless,

Are you satisfied with less?

Mind, I always find

You are very vast,

Move light-like fast.

That vastness can shame the ocean,

Keep in mind hey man.

Mind, will you mind to oscillate like a pendulum,

On to be or not to be - the podium?

Mind, should you always mind,

Whom to give shelter?

God or the devil?

The creation or the peril?

Mind, you are so fine, hiding invaluable gems within!

If you are Gold- like pure,

The salvation is sure!

Who can make you fit?

The goldsmith's deft hit?

Is there an easy tool kit?

কলঙ্কিত সভ্যতা

ডঃ অশোক কুমার মজুমদার

রক্তাক্ত হাতগুলো

উপরের দিকে উঠে,

প্রতিবাদের চেষ্টা করতে

শতশত বুলেটের ঘায়ে,

নিথর লাশগুলো

অমরত্ব পায়।

ভাষা দিবসের স্বীকৃতি

শহিদের দেহের উপর

রাখা গোলাপ ফুল

তরোয়ালকে বন্দি করে,

মাতৃভাষা সুগন্ধ ছড়ায়

দূর থেকে বহুদূরে

গিলেটিন থমকে দাঁড়ায়

জল্লাদরা রণে ভঙ্গ দেয়।

ভাষাবিপ্লবীদের সাথে

কবিতা গানে রজনীগন্ধার সৌরভে,

শহীদ বেদির পতাকা

মাতাল উত্তাল।

তোমায় দিতে পারি

শ্রী লীলাময় পাত্র

তোমায় দিতে পারি

আমার অভিমান,

মেঘে মেঘে জমা সুর

শ্রাবন দিনের গান।

এক মন এক নয়

মনে মনে কথা হয়,

এলোমেলো ভাবনা

জুড়ে জুড়ে কবিতা

দুরকে কাছে ডাকা

নতুন অভিযান।

মন নিয়ে খেলে মন

মেঘ রোদ সমাগম

প্রথম কদম ফুল

বৃষ্টির আগমন

বাতাসে ভাসে

আষাঢ় দিনের

বৃষ্টির কলতান।

॥ দুটি কবিতা ॥

আশু ভবিষ্যৎ

ডঃ বংশী মন্ডল

আদিগন্ত বিস্তৃত ঝলমল আলো,

আকাশে বহমান উদ্বেল আগ্নেয় বাতাস,

উষ্ণতার দাবানলে কুন্ডলী পাকিয়ে মরে মেঘ,

অপার্থিব শূন্যতায় ছড়িয়ে থাকে মৃত্যু গন্ধ।

ধরার বুকে মিলিয়ে যাওয়া জীবকুলের যত জীবাশ্ম,

মিছিলে মিছিলে বাস নেয় ভাসমান আলো কণায়,

সেখানেই মৃত্যু কুলের ঘর সংসার যার নাম যক্ষপুরী,

মৃত্যু বাস বানিয়ে কাল যাপনের আশ্রয়।

সে ধাম রহস্যের রাজবাড়ী কিন্তু নয়,

সেখানে মৃত বিশ্বাসের প্রাণ বায়ুদের অধিবাস,

জলমেঘের অযুত বিন্দু হয়ে খেলা করে,

আকুল শূন্যতার সঠিক জঠরে ঘর বাঁধার অপেক্ষায়,

যে ঘর আমাদের জীবনের আশু ভবিষ্যৎ।

ইতিহাস হতে চায় কবিতা শাবকেরা

ডঃ বংশী মন্ডল

সব অতীত তো আর ইতিহাস নয়,

দিন সপ্তাহ বছর সবই ডুবে যায় পরকালে,

কখনো ভীষণ রোদের দুপুর,

সর্বদা পুড়িয়ে মারে দিন,

আর্তির হাহাকারে কাল মরে আত্মহত্যায়,

পড়ে থাকে ছাইয়ের স্তুপ ঝোপেঝাড়ে,

মাঠে-ঘাটে ধরার গুহায়।

কত মানুষ মরে অহংকারের দাম্ভিকতায়,

কত মানুষ মরে পাশবীয় মনুষ্যহীনতায়,

কত চেতনা মরে শুদ্ধ চৈতন্য হীনতায়,

নিয়ত প্রবহমান ভাবনা মরে অবহেলায়,

সবার ইতিহাস স্থান পায় স্মৃতির কবরখানায়

কিছু আমার কবিতা শাবকের মৃত্যু চায়না,

অতীত হতে চায়না অকাল মৃত্যুর মালা পরে,

ইতিহাস হতে চায় আমার সাদা খাতার পাতায়,

কিছু শব্দগুচ্ছ রাবার দিয়ে মুছে কালের মিথ্যাচার।

সবুজ উপত্যকায় একদিন

ডঃ অশোক বিশ্বাস

বাস থেকে নেমে ঘড়ির কাঁটায় চোখ রাখলো অরিন্দম। সকাল ন'টা। মে মাসের শেষ, তবুও এখানে সকাল ন'টাতেও হাল্কা ঠান্ডার আমেজ। আকাশ মেঘলা। কাল রাতে এখানে বোধহয় বৃষ্টি হয়েছে। মাটি বেশ ভেজা ভেজা। হালকা কুয়াশার ঘেরাটোপ পেরিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সবুজ উপত্যকার উঠানামা। চা বাগানের সবুজ চাদর পেরিয়ে হাল্কা বনজঙ্গল, তারপর হিমালয়। শুধুই অনন্ত হিমালয়। পাহাড়ের চূড়াগুলো যেন একে অপরের আড়াল থেকে সমতলের পৃথিবীটাকে দেখছে। নরম রোদে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষন পরিবেশের সৌন্দর্য উপভোগ করল অরিন্দম। জায়গাটা চালসা। জলপাইগুড়ি জেলার ছোট্ট শহর, ডুয়ার্সের রানী নামে পরিচিত। গরুমারা ও চাপড়ামারি অভয়ারণ্য দিয়ে ঘেরা। অরিন্দম সমতলের মানুষ।চা বাগানের সবুজ উপত্যকাগুলো তার অসম্ভব ভাল লাগে।

বাস রাস্তার এই মোড়টাতে ছোট্ট একটা বাজার রয়েছে। একটা দোকানে বসে চা খেলো অরিন্দম। গরম চায়ের ছোঁয়ায় বাস জার্নির ক্লান্তিটা অনেকটা চলে গেলো। এবার তার গন্তব্য মাটিয়ালীর দিকে। তার মানে আরো উত্তরে। চায়ের দোকান মালিকের কাছ থেকে জানা গেল ইনডং টি গার্ডেন এখান থেকে আরো এগারো-বারো কিলোমিটার। অটো রিকশা বা ট্রেকারে কুড়ি পঁচিশ মিনিটের রাস্তা।

কুড়ি পঁচিশ মিনিটের রাস্তা শুনেই অরিন্দম নিজের মনের মধ্যে অস্থিরতা টের পেলো। দূর্বার সঙ্গে শেষ দেখা প্রায় বছর খানেক আগে কলকাতায়। দূর্বার ভীষণ স্ট্যাটিসটিক্স অনার্স নিয়ে পড়ার ইচ্ছা ছিল। কলকাতায় কাকার বাড়িতে থেকে অনেকগুলো কলেজে আপ্লাই করেছিলো। কিন্তু সব জায়গাতেই ভীষণ দলাদলি আর মুখ চেনাচেনির ব্যাপার। ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল দূর্বার, কোথাও ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পেয়ে। সেইসময় দূর্বার সঙ্গে পরপর দুদিন দেখা করেছিল অরিন্দম। অরিন্দমের তখন অনার্স পেপারের পরীক্ষাগুলো চলছিল। পরীক্ষার ব্যস্ততার মধ্যেও দূর্বার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের অভিজ্ঞতাটা একটা স্নিগ্ধ অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল অরিন্দমের মনে। ভীষণ স্বচ্ছ ও সুন্দর একটা মন আছে দূর্বার। বছর তিনেকের ফেসবুক ফ্রেন্ডশিপের দৌলতে সেটা জানতো অরিন্দম। ওর সহজাত সহজ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিল অরিন্দম।

গত এক বছরে ফোনে যতবার কথা হয়েছে ও অরিন্দমকে উত্তরবঙ্গে আসতে বলেছে। সমুদ্রের থেকে বরাবরই পাহাড় ভালো লাগে অরিন্দমের। স্কুলে পড়ার সময়ে বাড়ীর সবাইয়ের সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে এসেছিল। টয় ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখা চা বাগানের সবুজ উপত্যকা তাকে কল্পনার জগতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ছোটবেলার সেই স্মৃতি এখনও মনের মণিকোঠায় ধরা আছে।

কথা বলে একটা অটোরিকশা ঠিক করল অরিন্দম। দেড়শো টাকা ভাড়া নেবে। ড্রাইভার ছেলেটি অল্পবয়েসী। প্রথমে দুশো টাকা বলেছিলো। একটু চাপাচাপি করতেই দেড়শো টাকায় রাজি হয়ে গেল। আপনি এদিকে প্রথম

এলেন? প্রশ্ন করলো ড্রাইভার ছেলেটি। ঘাড় নাড়লো অরিন্দম। এরা সওয়ারীর কথাবার্তা থেকেই বুঝে যায় সওয়ারী নতুন না পুরোনো।

-বেড়াতে এলেন?ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল।

-খানিকটা তাই। উত্তর দিল অরিন্দম।

আরো দু-একটা মামুলি কথাবার্তার পর অরিন্দম দূর্বার বাবার নাম বলে জিজ্ঞাসা করল ছেলেটি চেনে কিনা।

-অরুন মিত্রের কোয়ার্টারে যাবেন আপনি? আমি খুব ভালো করে চিনি। খুব ভালো মানুষ। আমার বাবাও ঐ চা বাগানে কাজ করতেন। এখন রিটায়ার করে গেছেন।আমার নাম সুকুমার। আমার নাম বলবেন কাকু ঠিক চিনতে পারবেন।তাড়াতাড়ি অনেকগুলো কথা বলে গেল ছেলেটি।

একটু পরেই অটো রিকশা পৌঁছে গেলো টি গার্ডেনের গেটে। নিজের মধ্যে কেমন একটা জড়তা এসে গেল, সেটা অনুভব করল অরিন্দম।ফ্যাক্টরীর পাশ দিয়ে সোজা গিয়ে বাঁদিকে শেষ কোয়ার্টার, বলে দিল সুকুমার। ভাড়া মিটিয়ে সুকুমারকে বিদায় জানালো অরিন্দম। অরিন্দম যে আজই আসছে এটা দূর্বা জানেনা। শেষ যেদিন ফোনে কথা হয়েছিল সে হেঁয়ালি করে বলেছিল – কলকাতায় গরম বেড়ে গেলেই জলপাইগুড়িতে বেড়াতে যাবো।

পায়ে পায়ে মোরামের রাস্তা পেরিয়ে শেষ কোয়ার্টারের সামনে পৌঁছে গেল অরিন্দম। বাইরের দরজার পাশের কলিং বেলের সুইচে হাত রাখলো সে।ভেতরে কলিং বেল বেজে উঠল। বুকের মধ্যে শিরশির করে একটা স্রোত নেমে এল। এ বাড়ীতে দূর্বা ছাড়া কেউ তাকে চেনে না। কিভাবে বাড়ীর অন্যরা তাকে গ্রহণ করবে, মনে প্রশ্ন জাগল। একটা মিশ্র অনুভূতি টের পেল নিজের মধ্যে। একটু পরেই একজন ভদ্রমহিলা দরজা খুললেন।ইতস্তত করে নিজের নাম বললো অরিন্দম। তারপর যোগ করল- আমি কলকাতা থেকে এসেছি।একটু ভাবলেন ভদ্রমহিলা।ওহ, দূর্বার বন্ধু তুমি, এসো, এসো ভেতরে এসো।অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ভেতরে ডাকলেন ভদ্রমহিলা।

আপনি নিশ্চয়ই কাকীমা !বলে প্রণাম করতে গেল অরিন্দম। মুহূর্তে পিছিয়ে গেলেন উনি ও সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। আজকালকার ছেলেরা প্রণাম করে নাকি? তবুও প্রণাম করলো অরিন্দম।

-তুমি বসো, আমি দুর্বাকে ডাকি।

কাকীমা ভেতরে চলে গেলেন।

বসার ঘরটা বেশ ছিমছাম। বেতের চেয়ার, সাদা রং করা।ছোট একটা টি টেবিল।দেওয়ালে ছোট দুটো ওয়াল ম্যাট, ফ্রেমে বাঁধানো দুটো পেইন্টিং। দেখতে দেখতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল অরিন্দম। একটু পরে মুখ তুলতেই দেখল ভেতরের দরজায় দূর্বা দাঁড়িয়ে। পেছনে কাকীমা।

-চলে এলাম। অরিন্দম বললো।

-কোলকাতায় বোধহয় খুব গরম পড়েছে?

হাসলো অরিন্দম।

- ঘুমোচ্ছিলে?

- না, ঠিক ঘুম নয়! ইতঃস্তত করল দূর্বা।

কাল থেকে ওর জ্বর। এবার উত্তর দিলেন কাকীমা। সকালে ঘুম থেকে উঠেছিল। আমিই বললাম চুপচাপ শুয়ে থাক, তাহলে জ্বরটা কমবে।

- তাই বাধ্য মেয়ের মতো ঘুমোচ্ছিলে!মজা করল অরিন্দম।

উত্তরে দুদিকে ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালো দূর্বা।

-জ্বর কি খুব বেশি? জানতে চাইলো অরিন্দম।

-না, অল্প। একশোর কাছাকাছি। তবে মাথাটা বেশ ভার লাগছে। তাই চুপচাপ শুয়ে ছিলাম।

-বসো। চেয়ার দেখিয়ে বসার ইঙ্গিত করল অরিন্দম।

- তোমার কথা বলো।ভেতর চলে গেলেন কাকীমা।

-কি সে এলে,বাসে না ট্রেনে? জানতে চাইল দূর্বা।

-ট্রেনে।সকালে এনজেপি তে নেমেছি। তারপর বাস ধরেছি।

-তুমি ব্যাগ ট্যাগ কিছু আনেনি?

এই ভয়টাই করছিল অরিন্দম।ঘাড় নেড়ে জানালো আনেনি।

-কোলকাতা থেকে খালি হাতে! আজই ফিরবে নাকি? কপট রাগ দেখাল দূর্বা।

-ধরো তাই ! হেয়াঁলি করল অরিন্দম।

জেরা শুরু করে দিল দূর্বা। সত্যি কথাটা ওকে বলতেই হবে শেষ পর্যন্ত। তাই ছেড়ে ছেড়ে বলতে শুরু করলো। প্রথমে মালবাজার নেমেছিলাম। ওখানে হোটেলে একটা ঘর নিয়ে ব্যাগ-ট্যাগ রেখে আবার বাসে চালসা হয়ে এলাম।

-তুমি মালবাজারে হোটেলে থাকবে? আকাশ থেকে পড়ল দূর্বা।

এক মুহূর্তে অস্থির হয়ে উঠলো ও।

-তাহলে এলে কেন?

- না মানে, তুমি বাড়ী আছো কিনা! তাছাড়া বাড়ীর অন্য সবাই কি ভাববে !

দ্বিধাগ্রস্থ অরিন্দম। - ও ভয় পেয়েছিলে তাহলে। কথা শেষ করতে দিলো না দূর্বা। দেখো তুমি আমার মা-বাবাকে চেনোনা এটা সত্যি।

তাই বলে হোটেলে থাকবে? দাঁড়াও মা কে বলি যে তুমি মালবাজারে হোটেলে থাকবে বলে এসেছো। হঠাৎ উঠে পড়ল দূর্বা।

-দাঁড়াও দূর্বা। থামানোর চেষ্টা করলো অরিন্দম। কিন্তু ততক্ষনে ও বাড়ীর ভেতরে চলে গেছে।একটু পরেই কাকিমা এলেন। হোটেলের ব্যাপারটায় ভীষণ আপত্তি করে জানালেন যে আজই অরিন্দমকে হোটেলের ঘর ছেড়ে দিয়ে বিকালের মধ্যে এখানে চলে আসতে হবে। অরিন্দম খুব বাধ্য ছেলের মত রাজি হয়ে গেল এবার দূর্বা খুশি।

দুপুরটা এখানে ভীষণ চুপচাপ। কাকাবাবু দুপুরে খেতে এসেছিলেন কোয়ার্টারে, খেয়ে আবার অফিসে চলে গেলেন। উনিও খুশি অরিন্দম এসেছে বলে। বিকালের মধ্যে মালবাজার থেকে ব্যাগ ইত্যাদি নিয়ে চলে আসতে বললেন। আরো কিছু কথাবার্তা হল। বাড়ীর খবর নিলেন।পড়াশোনার খবর নিলেন।সব মিলিয়ে দুর্বাদের বাড়ীর পরিবেশ ভীষণ খোলামেলা।ব্যবহারও খুব আন্তরিক।বেশ ভালো লাগছে অরিন্দমের।

দুপুরের খাওয়ার পরে দুর্বাদের কোয়ার্টারের সামনের রাস্তায় একটু হাঁটল অরিন্দম। দুর্বার জ্বর বোধহয় বাড়ছে। ও এখন নিজের ঘরে শুয়ে।কাকিমা সংসারের টুকিটাকি কাজ সারছেন। দুপুর তিনটে নাগাদ অরিন্দম বেরিয়ে যাবে। মালবাজারের হোটেল থেকে ব্যাগটা নিয়ে আসতে হবে।এখন বোধহয় দুটো বাজে। হাতঘড়িটা দুর্বার কাছে।ওটা নিয়ে কোথাও গুছিয়ে রেখেছে হয়তো। বাগানের রাস্তায় আরও কিছুটা এলোমেলো ঘোরার পর কোয়ার্টারে ঢুকলো সে।দুর্বার ঘরে গেল।দূর্বা বোধহয় ঘুমোচ্ছে।পায়ের শব্দ পেয়ে চোখ মেললো।

-ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম? অরিন্দম বললো।

-বসো।চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললো দূর্বা। তুমি এলে, কোথায় গল্প করবো, বাগান দেখাবো, তা নয়, শুয়ে আছি।তুমি বোধহয় বোর হচ্ছো।খুব খারাপ লাগছে আমার। বললো দূর্বা।

-না, না ঠিক আছে।তুমি বিশ্রাম নাও।অরিন্দম আশ্বস্ত করল। পাশের টেবিল থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে দেখতে লাগল অরিন্দম চেয়ারে বসে।

-জায়গাটা কেমন লাগছে ? প্রশ্ন করলো দূর্বা।

- ভীষণ ভালো !

-ভালো লাগবেই। তোমার তো ছোটবেলা থেকেই একটা অবসেশন আছে চা-বাগান নিয়ে।

হাসল অরিন্দম। দূর্বাও হাসল।

এইভাবে আরও কিছু গল্প হল।সময় এগোচ্ছে।বেরোতে হবে অরিন্দমকে।এক সময় অরিন্দম বলল – দূর্বা ঘড়িটা দাও, এবার আমাকে বেরোতে হবে।বিছানা থেকে উঠলো দূর্বা, দেওয়াল আলমারী থেকে ঘড়িটা বের করল।ঘড়িটা নেওয়ার সময় হাতের স্পর্শে অরিন্দম টের পেল দুর্বার জ্বর অনেকটা বেড়ে গেছে।

ব্যস্ত হয়ে উঠলো অরিন্দম – তোমার তো গা পুড়ে যাচ্ছে।টেম্পারেচার একশোর অনেক বেশি হবে !

দুর্বাকে আস্তে করে ধরে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে কপালে হাত রাখলো তাপের আন্দাজ পেতে। মুখে বলল – বেশ গরম ! একশো দুই তিন হবে বোধহয়।চোখাচোখি হল দুর্বার সঙ্গে। কেমন অবশ হয়ে গেছে মেয়েটা।

ফর্সা মুখটা জ্বরের তাপে লালচে হয়ে গেছে কিছুটা। ঠোঁটটা কাঁপছে।অরিন্দম অবাক হয়ে গেল। দূর্বা কি কাঁদছে জ্বরের ঘোরে।বুঝতে পারলো না।অস্ফুটে বলল – কি হয়েছে তোমার ?

–কিছু না।বলে চোখটা বুজে ফেললো দূর্বা।

আস্তে আস্তে আলতো করে দুর্বার মুখটা তুলে ধরলো অরিন্দম।

দুর্বার জ্বর তপ্ত ঠোঁটটা এখনও অল্প অল্প কাঁপছে।হঠাৎ নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন অনুভব করল অরিন্দম। অদ্ভুত একটা অনুভূতি। সে আস্তে করে দুর্বার মাথায় একটা হাত রাখলো।অন্য হাতে ওর মুখটা তুলে ধরে আস্তে আস্তে নিজের ঠোঁটটা নামিয়ে আনল।জ্বর তপ্ত দুর্বার ঠোঁট দুটোও সাড়া দিল। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল।তারপর পিছিয়ে এল অরিন্দম।দেখল ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেছে দূর্বা।দু হাতে মুখ ঢাকা।কিছুক্ষন সেদিকে তাকিয়ে থেকে একসময় অরিন্দম বললো – আমি আসছি দূর্বা।বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে।তড়িঘড়ি কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসে মোরামের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে শুনতে পেল বাগানের কোন এক কোণে একটা নাম না জানা পাখি ডেকে চলেছে। অবিরাম।

একদিন সারাদিন

গৌতম রায়

--- আই ট্যাক্সি, রোখকে, দাঁড়াও, দাঁড়াও।

কাল রাতে ভালো বৃষ্টি হয়েছে। আমার টালির চালের ফুটো দিয়ে টপাটপ করে জল পড়ছিল গায়ে, ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। একটা বড়ো বাটি এনে বসিয়ে দিতে হয়েছিল বিছানায়। এবারে টালিটা সারাতেই হবে মনে হচ্ছে। এভাবে আর চলবে না। আর তাছাড়া সারাদিন যাকে বলে হাড়ভাঙা খাটুনির পর ঘুমটা যদি ঠিকমতো না হয় – তাহলে কারই বা ভালো লাগে? আর তাছাড়া রাতে বৃষ্টি হয়েছে বলেই বিছানাপত্তর বাঁচাতে পেরেছি। কিন্তু দিনের বেলা এরকম প্রবল বৃষ্টি হলে কে বাঁচাবে আমার বিছানাপত্র? সবতো ভিজে একেবারে ঢোল হয়ে যাবে। কাল রাতে যখন ফিরি – বৃষ্টির কোনো নাম গন্ধই ছিল না। তবে হ্যাঁ, প্রচন্ড গরম ছিল। একেবারে হাঁসফাঁস করা গরম। সেই তুলনায় এখন তো খুব সুন্দর ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়া হয়ে গেছে। হবেই তো, রাতে কি কম বৃষ্টি হল? পুরো কালবৈশাখীর তান্ডব হল। সকালে, আমাদের এই বাগবাজারের গলিতেও দেখি জল জমে আছে। প্রবল বৃষ্টি না হলে তো এই রাস্তায় জল জমে না। এই বৃষ্টিতে গরমটা কমল ঠিক কথা , কিন্তু রাতের ঘুমটা গেল। বৃষ্টির অত্যাচার সামলে আবার যে কখন ভোর রাতে ঘুমিয়ে পড়েছি – জানি না, তাই তো ঘুম উঠতে এত দেরি হয়ে গেল। আমি সকালে মোটামুটি ৬ টার মধ্যে রোজই বেরিয়ে পড়ি, আজ তো দেখি সাড়ে ছটা বেজে গেছে।

সবে বাগবাজার থেকে বেরিয়ে পুরোনো ২বি বাস স্ট্যান্ডের কাছেই আজকের প্রথম ডাক পেলাম। গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেখলাম – দুজন বয়স্ক মানুষ। লালপাড়, সাদা শাড়ি, মোটা করে সিঁদুর পরা - বয়স তো সত্তরের কাছাকাছি হবেই। সঙ্গের ভদ্রলোক ধুতি পাঞ্জাবি পরা, মোটা ফ্রেমের চশমা, হাতে পুজোর ডালি। বুঝলাম হয় দক্ষিনেশ্বর নয় কালীঘাট যেতে চায়।

- কোথায় যাবেন?

- কালীঘাট যাব বাবা। দরজাটা খোলো।

সকাল বেলা প্রথম ভাড়া বেশ অনেকটা রাস্তার, তার ওপর একেবারে শান্তিপূর্ন প্যাসেঞ্জার। দরজাটা খুলে দিলাম। ভদ্রমহিলাকে আগে উঠতে বললেন।

--- ওঠো, ওঠো, সাবধানে ওঠো। আহা, শাড়িটা টেনে নাও, সিটে আটকে আছে তো। সাবধান – মাথাটা দেখে –হ্যাঁ, বোসো এবার।

ভদ্রমহিলাকে সাবধানে তুলে দিয়ে ভদ্রলোক নিজেও উঠে বসলেন সাবধানে। তারপর দরজাটা দুবারের চেষ্টায় ঠিকমতো বন্ধ করলেন।

- দ্যাখো, সব ঠিকমতো নিয়েছো তো? কার কার নাম পুজো দেবে? যদি বাপনদের নামেও পুজো দাও। আর একটা ডালা কিনতে হবে তাহলে, মনে রেখো। নেমেই তাহলে হুড়মুড় করে ঢুকে যেয়ো না যেন।

- আরে বাবা সব ঠিক আছে। এই একই কথা তুমি কাল থেকে কতবার বললে বল তো? বকবক করে তো কানের মাথা খারাপ করে দিলে। তুমি বাড়ির চাবিটা নিয়েছ তো ভালোভাবে ? দেখো একবার । সেবারের মতো আবার না হয়, সেবারে কী কান্ড-ই না হল। শেষে মনিকে অফিস থেকে ছুটে আস্তে হল বাড়ির চাবি খোলার জন্যে। আবার এরকম হলে কিন্তু আমি আর ওকে ডাকতে পারব না বলে দিলাম। সারাদিন তখন বাইরে বসে থাকতে হবে।

- আরে নিয়েছি তো। এই দেখো চাবি। একবার ওরকম ভুল হয়েছিল বলে কি আর বারবার হবে? আশ্চর্য ! তাও সেবারে ঐরকম ভুল হল তার কারণ – তুমি বেরোবার সময় এমন তাড়াহুড়ো করলে যে আমি তো ঘরে পড়ার চটি পরেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। কী কান্ড !

- হ্যাঁগো, বাবু –র কোনো ফোন বা মেল পেলে? কবে আসবে ওরা কিছু বলেছে? আমার দাদুভাইকে কতদিন দেখিনি। সেবারে যখন গেল এখান থেকে – ওইটুকু বাচ্চার কী কান্না! এইতো – দেখতে দেখতে দু বছর হয়ে গেল, ফোনে শুধু কয়েকবার কথা হয়েছে --- এখন তো দাদুভাই ওখানের স্কুলেও নাকি ভর্তি হয়ে গেছে ! এতো দিন পর আমাদের দেখে আবার চিনতে পারবে তো? – আমি এখনও বুঝি না, এরকমভাবে ঘর, সংসার, সবাইকে ছেড়ে ওই এতদূরে বিদেশ বিভুঁই-এ থেকে কী লাভ হয় ! শুধু বেশি রোজগার হলেই সব হয়ে যায় ? একটা বাচ্চা, তার বাবা,মা সবসময়েই শাসন করে চলে। একটুও দাদু-দিদাকে পায়না। দাদু-দিদা ছাড়া বাচ্চারা আবদার করবে কার কাছে? কার কোলে বসে রাজপুত্তুরের গল্প শুনবে? এগুলোর কি কোনো দাম নেই? ছোট থেকে যদি কল্পনার জগৎটাই না ঠিক মতো তৈরি হয়, তাহলে কী হবে বলো তো ? শুধুই পড়াশোনা করে কি কেউ মানুষের মতো মানুষ হয়? বাবুটা ছোটো থেকে এরকম চাকরি-চাকরি, পয়সা –পয়সা করত না। বিয়ের পরেই কিরকম যেন অদ্ভুতভাবে পাল্টে গেল। ভাল্লাগে না এসব!

- তা যা বলেছ। এখানে যখন ছিল, বিশেষ করে বিয়ের আগে, আমাদের কত খবর রাখতো! কিছু না হোক অফিস থেকে ফিরে আমাদের কাছে বসে একটু গল্প-গুজব করত, এটা-ওটা খেতেও চাইতো তোমার কাছে। এখন দেখো, মাসে মাসে একাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিয়েই সব দায়িত্ব শেষ। কী হবে ওর টাকা? আমি তো ভালোই পেনশন পাই এখন ও। কতবার তো বলেছি – টাকা পাঠাতে হবে না, তবু পাঠায়। আমি ওর টাকায় হাতও যে দিই না – ও ওসব বোঝে না। ওভাবে টাকা দিয়েই সব দায়িত্ব সারা হয়ে যায়? আরে বাবা, বাবা-মা বুড়ো হয়েছে, কবে বলতে কবে কী হয়ে যায়, এখন তো ছেলেমেয়েদের একটু কাছাকাছি থাকা দরকার, তাই না? আর কিছু না হলেও, একটু তো ওদের দেখতেও ইচ্ছে করে, কথা বলতে ইচ্ছে করে – সেটাই বোঝে না। কী যে সব ভাবে – কে জানে !

- আরে, আমি তো বাবুকে সেবারে কতবার করে বললাম। ও বলল এখানে ছেলের পড়াশোনা ঠিকমত হবে না, তাই নাকি বিদেশে থাকতে হবে ওকে! যত্তসব ভুলভাল যুক্তি, এদেশে যেন কেউ পড়াশোনা করে না ,পড়াশোনা করে কেউ মানুষ হয় না !

- সেদিন তো বলল ওরা Green Card এর জন্য Apply করে দিয়েছে। সেদিন ওদের কথা শুনে মনে হল – একেবারে মোক্ষলাভ হয়ে যাবে এবার। জীবন ধন্য হয়ে যাবে। এই দেশের মাটিতে বড়ো হল, বাবা মায়ের প্রাণান্তকর চেষ্টায় মানুষের মতো মানুষ হল – এবার বিদেশই নিজের ভালোবাসার দেশ হল। স্বার্থপর, স্বার্থপর। ওরা সবাই স্বার্থপর। শুধু নিজের

ভালোটাই বোঝে। কারোর ওপর কোনো দায়িত্ব নেই যেন। বাবা-মা-র ওপরেও কোনো দায়িত্ব নেই, নিজের দেশের ওপরেও কোনো দায়িত্ব নেই। দেখলে তো, মিসেস গুহ কবে থেকে মরে পড়েছিল ঘরের মধ্যে – কেউ জানতে পেরেছিল? যখন বডিটা বার করা হল – গায়ে পোকা ধরে গেছে। আর ছেলে তখন নিশ্চিন্তে বিদেশে ফুর্তি করছে ! ছিঃ। এটা কি একটা জীবন ?

রাবিশ। আবার বিদেশে গিয়ে কথায় কথায় বলবে – এদেশের কিস্যু হবেনা। কোনো ভবিষ্যৎ নেই। Idiot ! সবাই পড়াশোনা করে এখানকার মাটিতে মানুষ হয়ে বিদেশের সেবা করতে চলে যাচ্ছে। তাহলে দেশের ভালোটা করবে কে ? বেশি রোজগার আর ভালো থাকা ছেড়ে দেশের কাজ কেউ না করলে দেশটা চলবে কী করে ? ভালো হয়ে উঠবে কী করে ? ওসব বড়ো বড়ো কথা সবাই বলতে পারে। করে দেখাক না একবার ! আমাদের আগের Generation –এর দাদা-কাকারা কত কষ্ট করে স্বাধীনতা এনে ছিল। আর এইটা তার প্রতিদান! যত্তসব বিরক্তিকর !

ওদের কথা বেশ চলছিল। শুনতে বেশ ভালোই লাগছিল। কিন্তু এর পরেই একটা ফোন এল আমার ফোনে – দেশ থেকে বৌ ফোন করেছে। গাড়ি চালাতে চালাতেই কথা বলে নিলাম এবং তারপর দেখলাম কালীঘাট এসে গেছে। ওদের নামিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম।

বেশিক্ষন অবশ্য দাঁড়াতে হল না। একটি কমবয়সী দম্পতি উঠল ট্যাক্সিতে। বলল কসবা বোসপুকুর যাবে। কালিঘাটে পুজো দিয়ে আসছে বোঝা যায়। গাড়ি স্টার্ট করে মন দিয়ে ওদের কথা শুনতে লাগলাম – আজ মনে হয় আর তোমার অফিস যাওয়া হবে না। এখনই দেখো প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গেছে। এরপর বাড়ি যাব। তারপর রান্না বসাবো। আসার সময়ে তো তোমার মাকে বললাম দেখলে যে- মা, আপনি চা-টা খেয়ে ভাতটা একটু বসিয়ে দেবেন, আমি এসে বাকিটা করে নেব। কিন্তু গিয়ে দেখব আমি জানি – যে কিছুই করেনি। ছেলের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে মানে বাড়িতে একটা বিনা পয়সার কাজের লোক এনে দিয়েছে। এবার সব তুমি করো। বাপের বাড়িতে আমার মা আমায় কুটোটি নাড়তে দেয়নি কোনোদিন। আর এখানে এসে দেখ, সেই ভোর থেকে রাত অবধি খেটে খেটে মরে যাচ্ছি। নিজের দিকে একবারও তাকাতে সময় পাইনা। সাজগোজ তো সব উঠেই গেল। তাও বাবা এক রকমের রান্না হলে – ভাবতাম ঠিক আছে। কিন্তু একজনের ঝোল হলে অন্যজনের ঝাল চাই। আর একজনের আবার ভাতে চাই। একজনের ঝাল রান্না হলে অন্যজনের আঝালা। চারজন মানুষের জন্য রোজ চল্লিশ রকম রান্না ! বায়নার কোনো শেষ নেই। দাসী বাঁদি একজন আছে – ঠিক সব করে দেবে !

- চুপ করো তো, সেই একই কথা সবসময়।

- তুমি চুপ করো। কিছু বললেই তো – চুপ করো। কী ভুলটা বলেছি আমি ? বিয়ের আগে যদি জানতাম না এসব, কে বিয়ে করতো এখানে ? কত ভালো ভালো সম্বন্ধ এসেছিল আমার জানো তুমি? ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, রেলের বড়ো অফিসার। ওদের তো খুব পছন্দ হয়েছিল আমায়। নেহাৎ তখন রোজ কাঁদতে – তোমায় ছাড়া আমি বাঁচবো না – আমি তোমার মায়া কান্নায় ভুলে গেলাম। ওমা, বিয়ের কনে আসা থেকে শুধু কাজ আর কাজ। একটা দিনের জন্যেও কোনো ছুটি নেই আমার। তার ওপর – একটু রান্নার এদিক ওদিক হলেই তো তোমার বাবা টান মেরে সব ছুঁড়ে ফেলে দেয় । আবার নতুন করে সব করতে হয়। কোথায়? তখন তো তোমার বাবাকে কিছু বলতে শুনিনা? তখন তো বাবার ভালো ছেলে হয়ে চুপ করে বসে থাকবে আর একমনে কাগজ পড়বে ! কী ভাব? বুঝি না কিছু? সব বুঝি! এই আমি বলেই তোমাদের সংসারে এখনও এতো লাঠি ঝাঁটা খেয়ে পড়ে আছি। অন্য কোনো মেয়ে হলে না – কবে পালিয়ে যেত সব কিছু ছেড়ে। তার ওপর শাশুড়ির সব ব্যাপারে ট্যাঁকস ট্যাঁকস কথা। এতো লোককে ভগবান রোজ নেয় – আমায় যে কেন নেয় না – কে জানে !

কিছুক্ষণ হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে যায়। সব কথা থেমে যায়। আয়নায় দেখতে পেলাম দুদিকে দুজন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। কাছাকাছি অবশ্য এসেও গেছি। প্রায় বিজন সেতুর শেষের দিকে চলে এসেছি। হঠাৎ আবার শুরু হল কথা। মেয়েটি হঠাৎ দেখি বেশ মিষ্টি করে বলছে -

আই শোনো, আজ ছেড়ে দাও না গো, অফিস আর যেতে হবে না। চল ধীরে সুস্থে রান্না করে, চান খাওয়া শেষ করে প্রিয়াতে একটা সিনেমা দেখে আসি। মলির মা সেদিন বলছিল – সিনেমাটা খুব সুন্দর হয়েছে। চল না গো। Please! কতদিন সিনেমা যাওয়া হয়নি। তারপর সিনেমা দেখে হাটারি থেকে ফিশফ্রাই খেয়ে আসব। চলো না গো, চলো চলো Please-

- হ্যাঁ যাওয়াই যায়। দেখি বাড়ি যাই। তারপর দত্তদাকে একটা ফোন করে দেখি। তবে, বুঝতেই পারছো তো – এখন মাসের শেষ চলছে , এইসময় –

- ঠিক আছে। তোমার টাকা না থাকলে আমি দেব, আমার কাছে আছে।

- কী করে টাকা এল তোমার কাছে ?

- সে আছে মশাই ! সেবারে যে অত কাগজ বিক্রি করলাম, শিশি বোতল বিক্রি করলাম, সেই টাকা তো সবই আছে। আমি আর একা একা কিসেই বা খরচ করবো , এরকম মাসের শেষের জন্যেই তো তোলা থাকে। চলো। আজ তাহলে যাব, ঠিক আছে ? বাড়ি গিয়ে আবার মা বাবার সামনে বিগড়ে গিয়ে অন্য কথা বলো না কিন্তু, Please!

ওরা নেমে গেল ওদের জায়গায়। আমি গাড়ি রাস্তার ধরে পার্কিং করে রেখে পাশের চায়ের দোকানে চা খেতে গেলাম।

চা – টা বেশ আরাম করেই খাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা সুটেড – বুটেড লোক মুখে একগাদা পান পুরে উচ্চৈঃস্বরে মোবাইলে কথা বলতে বলতে আসছে। এতো জোরে ফোনে কথা বলছে যে আমার মনে হল – যে আর একটু জোরে যদি ও কথাগুলো বলতে পারে, তাহলে ওপর প্রান্তের লোক এমনিতেই সব শুনতে পেয়ে যাবে। কোনো ফোনের দরকারই আর থাকবে না।

ট্যাক্সিটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে লোকটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল তারপর যাতে জামায় না পানের পিক পড়ে যায় – তাই মাথাটা একটু উঁচু করে চিৎকার করতে লাগল –

- এ কিস্ কা ট্যাক্সি হ্যায় রে ? তারপর আমায় দেখতে পেয়ে, আমার ইউনিফর্ম দেখে চিনতে পেরে বলল –

- এ ভাই, যারা চল না। বহুত লেট্ হো গিয়া –

এই এক মুশকিল ! অনেকেই পকেটে টাকা রাখতে পারলে আমাদের মতো ট্যাক্সিওলাদের বা রিক্সাওলা বা এরকম সবাইকে তুই-তোকারি করে। প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগত, হাজার হলেও আমি একজন গ্র্যাজুয়েট। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। অভাবের সংসার, অনেক চাকরি খুঁজেও চাকরি পেলাম না, তাই ট্যাক্সি চালাই ভাড়ায়। তার জন্য তুই-তোকারি করবে কেন ? এটা তো আমার প্রফেশন ! এতে অন্যায়ের কী আছে ? এখন আমিও যদি ওকে তুই-তোকারি করে উত্তর দিই, ওর মান থাকবে তো ?

- একটু দেরি হবে, চা খাব।

- আরে, চল্, চল্ বাবু বহুত দের হো গয়া।

ট্যাক্সিতে উঠে একবারই শুধু আমায় বলে দিয়েছিল – ডালহৌসি – স্টিফেন হাউসে যাবে। তারপর থেকে পুরো রাস্তাটা চিৎকার করে শুধু ফোনে কথা বলে গেল। দেশোয়ালী ভাষায় একবার শুনলাম কম্বলের দাম নিয়ে কথা হচ্ছে, কিছুক্ষন পর আবার গরুর দুধের ব্যবসা নিয়ে কথা বলছে। আয়না দিয়ে দেখলাম - এতো জোরে চিৎকার করছে যে মাঝেমাঝে মুখ থেকে পানের কুচো ছিটকে আসছে। ইস্ ! জঘন্য একেবারে।

আমি অবশ্য জানি, স্টিফেন হাউসের সামনে অপেক্ষা করতে বললে – মোটেই শুনবো না। পুরো পেমেন্ট দিয়ে তারপর যেদিকে ইচ্ছে যাক বাবা ! ওঃ ! সেবারের সেই লোকটা ডানলপ থেকে উঠে প্রথমে বললো – দক্ষিনেশ্বর যাবে। গেলাম। তারপর পুজো দিয়ে প্রায় এক ঘন্টা পর এসে বললো কালীঘাট যাবে। আবার গেলাম। অপেক্ষা করলাম। দামি মক্কেল ! তীর্থ করতে বেরিয়েছে। তারপর আবার পুজো দিয়ে এসে বলল স্টিফেন হাউসে যাবে একবার – অফিসে। গেলাম। তারপর আমায় বললো – পাঁচ মিনিটে আসছি। বলে সেই যে গেল – আর এল না , তার অপেক্ষায় প্রায় দুঘন্টা দাঁড়িয়ে বুঝলাম – যে স্টিফেন হাউসের অন্য দিকের দরজা দিয়ে সে কেটে পড়েছে। তখন সবে নতুন ট্যাক্সি চালাচ্ছি, অতশত বুঝিও না। পুরো চিটিং হয়ে গিয়েছিল সারাদিনের গাড়ি ভাড়া। এখন ঐজন্য আর কোথাও ওয়েটিংয়ে থাকি না। পুরো ভাড়া নিয়ে নিই আগেই।

এই লোকটি অবশ্য আমায় ওখানে অপেক্ষা করতে বলল না। নিজের মনেই কথা বলতে বলতে যা ভাড়া হয়েছে তার থেকে একটু বেশিই দিয়ে অফিসে ঢুকে গেল। লাভের মধ্যে এতক্ষন চিৎকার করে আমার কানের অবস্থা খারাপ করে দিয়ে চলে গেল।

ডালহৌসিতে পুলিশ ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রাখতে দেয় না। তাই ধীরে ধীরে ধর্মতলার দিকে যেতে থাকলাম।

কার্জন পার্কের কাছেই একটা ভাড়া পেয়ে গেলাম। মাঝবয়সী লোক, হাতে একটু ভারী এটাচিকেস। বলল এয়ারপোর্ট যাবে। তুলে নিলাম।

- হ্যালো রীনা, আমি ট্যাক্সি পেয়ে গেছি। এয়ারপোর্ট চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটেই পৌঁছে যাবো। তুমি বেরিয়ে পড়েছো তো ? - কী বলছ, এখনও বেরোও নি? কী করছো কী তুমি ? বেহালা থেকে আসতে তোমার কত সময় লাগবে জানো? ওদিকে পুরো ট্রাফিক জ্যাম থাকে সবসময়ে। তোমার তো দু-ঘন্টা লেগে যাবে গো ? দেরি হয়ে যাবে তো? কী বলছ? ওলা বুক করে দিয়েছো ? কী বলছে – কতক্ষনে আসবে? ঠিক আছে, এসো । যত তাড়াতাড়ি পারো এসো ।

এরপর কিছুক্ষন নীরবতা। তারপর আবার ফোন – শোনো, আমি অফিস থেকে উঠে পড়েছি। ট্যাক্সিতে আছি। এখন তাড়া থাকবে। আমি একেবারে বম্বে পৌঁছে তোমায় জানিয়ে দেব।

বিল্টুকে আর মিষ্টিকে একটু বুঝিয়ে বল যে বাবা দুদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে আর তোমাদের জন্যে খেলনা আনবে। আর বাবার ওষুধগুলো এনেছি, আলমারিতে রেখে এসেছি। তোমায় দেখিয়ে আসতে ভুলে গেছি তাড়াহুড়োতে। একটু দেখে নিও, টাইমলি ওষুধগুলো দিও।

কিছুক্ষন আবার সব চুপচাপ। হঠাৎ গুনগুন করে গানের আওয়াজ পেলাম। বুঝলাম প্রেমিকাকে নিয়ে বেড়াতে যাবার আনন্দে মনটা খুশি হয়ে আছে। থাকুক, কী আর করা যাবে।

একটু পরে তার ফোনটা বেজে উঠল। শুনতে পেলাম – গাড়ি এসেছে ? ও, অনেকটা চলে এসেছো ? Good ! Good ! জানো তো, আমি এখন ভীষণ Excited তোমাকে নিয়ে এভাবে যেতে পারছি বলে। এখন দু-তিন দিন তুমি শুধু আমার। তোমায় নিয়ে ইচ্ছে মতো খেলবো আমি এবার! তুমি কিন্তু কোনো ব্যাপারেই না করতে পারবে না। এটা বলে রাখলাম।

ওদিক থেকে কী কথা হল – বুঝতে পারলাম না। কিন্তু দেখলাম সেই কথা শুনে ভদ্রলোক একেবারে হাসিতে গড়িয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ একটু চাপা গলায় বলে উঠল – আই, তোমার বর কিছু Guess করেনি তো? দেখো, আবার শুধু শুধু অশান্তিতে জড়িয়ে যেয়ো না যেন।

তারপর আবার কিছুক্ষন চুপচাপ। কী যেন বলছে ওদিক থেকে। তারপর ফের সেই খুশি খুশি গলা –

- আরে না, না, তুমি চিন্তা করো না। আমি তো বৌকে বলেছি অফিসের কাজে দুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। সারাদিন মিটিং চলবে, ফোন টোন কোরো না যেন। আমিই রাতে ফোন করব। ওসব ছাড়ো, জানো আমার এখন কী মনে হচ্ছে ? সেই তোমার সঙ্গে যেদিন আমি প্রথম দেখা করতে যাই – সেদিন যেমন মনে হচ্ছিল, আজ আবার সেরকম মনে হচ্ছে আমার। সেই যে গো, সেই যে গানটা আছে না – আজ উনসে পহেলি মুলাকাত হোগি। - একেবারে সেরকম লাগছে। ... উমমম সোনা। I love you ! শোনো একটা ফোন আসছে আমার অফিস থেকে। পরে আবার করব। তুমি Airport-এর departure গেটের বাইরে এলেই দেখতে পাবে – আমি আছি। ওকে? বাই সোনা !

- হ্যালো, কে ভটচাজ্ দা ? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার ড্রয়ারের চাবি তো আমি দেবাশীষকে দিয়ে এলাম, কী বলব বলুন। শ্বশুর মশায়ের একেবারে এখন তখন অবস্থা ! এইসময় একবার না গেলে হয় ? সবচেয়ে বড়ো কথা – একবার না গিয়ে এখন দাঁড়ালে বিরাট গৃহ অশান্তি শুরু হয়ে যাবে। বোঝেন তো সব, আমার বৌ আবার ভদ্রলোকের একমাত্র মেয়ে। তাই যেতেই হচ্ছে, ওই দু-তিন দিনের মধ্যেই চলে আসব। হ্যাঁ হ্যাঁ , ডিভিশনাল মিটিং এর আগেই ফিরে আসবো। কোনো চিন্তা করবেন না। ওকে ? রাখছি? – বাই !

ফোন কেটে দিয়েই আবার সেই মহিলাকেই ফোন, তারপর ফোনে সে কত গল্প। ওদের প্রেম কাহিনী আর শুনতে ইচ্ছে হলো না। শুধু ফোনটাকেই যখন বারবার শব্দ করে চুমু খাচ্ছিল, আমি চমকে গিয়ে একবার পেছন ফিরে দেখতে বাধ্য হয়েছিলাম।

এয়ারপোর্টে সেই প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে নিজের ট্যাক্সির নম্বর লিখিয়ে পরে প্রি-পেইড প্যাসেঞ্জার ভাড়ার জন্য অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষন। বেশিক্ষন অপেক্ষা করতে হলো না। কিছুক্ষন পরেই আমার ট্যাক্সির পালা এল। দেখলাম উদভ্রান্ত হয়ে একটি কমবয়সী মেয়ে আর তার সাথে মনে হয় তার স্বামী আর একটি ছোট ছেলে উঠলো। বলল হাওড়া – বোটানিক্যাল গার্ডেন যাবে। তাদের ব্যাগটা ডিকিতে রেখে ট্যাক্সিতে উঠেই মেয়েটি খুব বিনয়ের সাথে কান্না কান্না গলায় বলল – দাদা, খুব জোরে চলুন প্লীজ, বাড়িতে খুব বিপদ হয়ে গেছে। একটু দেখুন, যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ! আমিও সাধ্যমতো জোরে চালিয়ে দিলাম গাড়ি। বুঝলাম কোনো আত্মীয়ের কিছু একটা হয়েছে। ছেলেটি বলছে –

- আরে, কেন শুধু শুধু কেঁদে চলেছো বলতো? আগে খারাপটাই ধরে নিচ্ছ কেন ? হয়তো মা'র শরীরটা খারাপ হয়েছে বলে বাবা ফোনটা করেছিলেন। আগে গিয়ে দেখি – চলো, কাল থেকে তুমি তো শুধু কেঁদেই চলেছো? কোনো মানে হয় ?

- ও তুমি বুঝবে না, নিশ্চয়ই মা আর নেই। নয়তো বাবা কখনও ওরকমভাবে ফোন করে? তোমার কি মনে হয়, মা-এর একটু শরীর খারাপ হলে বাবা আমাদের ফোন করে বলবে – সম্ভব হলে একবার আসতে! বাবা জানে বিদেশ থেকে হঠাৎ এভাবে আসা খুব-ই শক্ত। তাও তো আমরা সবচেয়ে আগের ফ্লাইটটা ধরেই চলে এলাম।

- হুম, সেটা ঠিক, আমার কেন জানিনা শুধু মনে হচ্ছে – মা আর নেই। মা কে আর দেখতে পাবো না ! সেই যে আগের মাসের শেষের দিকে সেই মা একবার ফোন করে অনেকক্ষন কথা বলছিল না ? সেদিন কথায় কথায় মা একবার বলেছিল – তুই এতো দূরে থাকিস খুকু, তোকে এতো করে একবার দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু দেখা হয় না। এবার দেখবি কবে বলতে কবে হঠাৎ একদিন চলে যাব, আর দেখা হবে না। - সেই কথাটাই কানে খুব বাজছে এখন! সত্যি, মা-বাবাকে ছেড়ে এতদূরে ওই বিদেশে বিভুঁই –এ পড়ে থাকা – এ আর আমার ভালো লাগে না। কি জানি মা এখনও আছে কিনা !

- শোনো, পিকলুকে কিছু তো খাওয়ালে না, ও কি খাবে ? ও তো ঘুমিয়ে পড়ল দেখছি, কী করবে?

- আমি জানি না গো। তুমি আজ ওকে দেখো Please। কী খাওয়াতে হবে তুমি দেখো। আমি এখন মা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না, তুমি Please দেখো ওকে।

পুরো রাস্তাটা মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে এল। কী জানি, মায়েদের কিছু হলে বোধহয় মেয়েরা একটু আগেই বুঝে যায় সব।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে ওদের বাড়ির সামনেই একটা জটলা হয়ে আছে। গাড়ির দরজা খুলে মেয়েটি আগে নেবে একছুটে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। আর বোধহয় তাকে দেখেই - কান্নার রোল উঠল ঘরের ভেতর থেকে।

প্রায় বেলা দেড়টা বাজে। বেশ খিদে খিদে পাচ্ছে। কিন্তু কোথায় খাবো ? আশেপাশে তো কোনো ভাতের হোটেল দেখছি না! কী করব বুঝতে পারছি না। এদিকে ভাতের হোটেল খুঁজবো ? না কি ওই পিজি হাসপাতালের ওখানে গিয়ে ভাত খাব ? কোনটা ঠিক হবে?

গাড়ীটা স্টার্ট করে ঘুরিয়ে নিলাম। একটু এগিয়ে আসতেই দুটি তরুণ তরুণীর সঙ্গে দেখা।

- দাদা, যাবেন ?

- কোথায় যাবেন ?

– ফোরাম মল।

ভালোই হল, ওদিকে অনেক ভাতের হোটেল আছে, আর অতটা রাস্তা – ফাঁকাও যেতে হল না। ওদিকের প্যাসেঞ্জার পেয়ে গেলাম। ওদের বেশ –ভূষা দেখে মনে হল – কলেজে পড়া ছেলেমেয়ে। ক্লাস কেটে বোধহয় সিনেমা চলল, ওরা উঠে চাপা স্বরে কথা বলছিল –

– এই, কেউ দেখেনি তো তোকে ?

- না না, আমি শুধু পিয়ালীকে বলে এলাম – আমায় কেউ খুঁজলে বলবি শরীর খারাপ লাগছিল, বাড়ি চলে গেছি। SM এর ক্লাশে কী পড়া হয় সেটাও দেবে বলেছে। এই শোন্, তোদের ওই বন্ধুগুলো যেন কেমন! আমায় দেখলেই হাসে। তোর নাম ধরে আওয়াজ দেয়। তুই কি ওদের কিছু বলেছিস?

- আরে দুর ! বলব কেন? একবার শুধু আমার মোবাইল থেকে তোর ছবি দেখেছিল। সেই যে নেভি ব্লু টপ আর কালো জিনসের প্যান্টের ছবিটা। তারপর থেকে আমাকেও ওরা ওরকম করে। আশ্চর্য !

- হ্যাঁ, যতো ভুলভাল ব্যাপার, নিজেরাও তো সব যে যার সঙ্গে একেবারে Going Steadily! জানি না আমি? সব জানি। ওই যে নীলাদ্রি , ওকে একদিন দেবলীনার সঙ্গে ফাঁকা ক্লাসে যেরকম দেখেছি না – সে ভাবতে পারবি না। ওদের আবার বড়ো বড়ো কথা। দেবলীনা ও বেশ বলে – না, না, ও পা হড়কে পড়ে গিয়েছিল আমার বুকের ওপর ! বুঝে দেখ একবার ! বলে পা হড়কে পড়ে গেছে একেবারে বুকের ওপর। আরে বাবা, সৎ সাহস থাকলে সোজাসুজি বলবি – যা করেছি বেশ করেছি। তা নয় পা হড়কে ছিল ! ঢপ মারার জায়গা পায়নি !

- শোন, শোন – বুকের ওপর কিভাবে পড়েছিল রে ? দেখা তো একবার?

- তাই, না? খুব মজা ! তোরও এবার বুকের ওপর পড়তে ইচ্ছে করছে? না না ওসব হচ্ছে না। আমি ওসব একদম পছন্দ করি না।

তারপর কিছুক্ষন দেখি সব চুপচাপ। আয়নাটা একটু ঘুরিয়ে দেখি ওরা পরস্পর পরস্পরের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে আর ওদের বুকের মধ্যে জমিয়ে রাখা সমস্ত কথা শুধু চোখের ভাষায় পরস্পরকে বলে চলেছে। বড়ো ভালো লাগল এই সজীব শুদ্ধ প্রেমের অনুভূতি দেখতে। এই বয়েসেই এরকম শুদ্ধ ভালোবাসা মানুষ বাসতে পারে। বড়ো ভালো লাগে এইরকম স্বর্গীয় দৃশ্য দেখতে। কিছুক্ষন আড়চোখে তাকিয়েও ছিলাম ওদের ওই মুগ্ধ চোখের দিকে। কিন্তু হঠাৎ ছেলেটা আয়নার দিকে একবার তাকাতে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। আমি লজ্জা পেয়ে চোখ সরিয়ে নিলাম। আয়নাটাও একটু ঘুরিয়ে দিলাম। আয়না ঘোরাতে গিয়ে দেখলাম ওদের দুজনের হাতে হাত বাঁধা না

পড়ে আছে। কিছুক্ষন পর খুব চেনা কিছু শব্দ ও পেলাম। বুঝলাম – ওরা পরস্পরকে আদর করছে। কলকাতা শহরে তো একটু নিজেদের মতো সময় কাটাবার জায়গাও পাওয়া যায় না, তাই এইসব ছেলেমেয়েদের হয় অন্ধকার সিনেমা হল আর নয়তো এরকম ট্যাক্সি-ই ভরসা।

ওদের এলগিন রোডে ফোরাম মলের সামনে নামিয়ে ঘড়িতে দেখি বেজে গেছে প্রায় আড়াইটে। খুব খিদে পেয়েছে। সেই কখন ভোরবেলা দুটো রুটি আর কাল রাতের রাখা তরকারি খেয়ে বেরিয়েছি, আর পারছি না। এখন কিছু খেতেই হবে।

ভাড়া বুঝে নিয়ে ট্যাক্সীটা সবে স্টার্ট করতে যাচ্ছি, দেখলাম দুটো অবাঙ্গালী ছেলে উদ্ভট সাজ পোশাক আর হেয়ার কাট নিয়ে আমায় কিছু না বলেই দরজা খুলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু এরকম পরিস্থিতিতে আমি আগে থেকে গাড়ির দরজা লক করে রাখি। তাই খুলতে পারল না। আমি মুখ বাড়িয়ে বললাম – যাবে না এ গাড়ি।

- কিঁউ নেহী যায়গা ? তেরা বাপ্ যায়েগা। দরওয়াজা খোল।

এসব গা সওয়া হয়ে গেছে আমাদের মতো ট্যাক্সি ড্রাইভারদের। ওরা দরজা খুলতে না পেরে গাড়ির দরজায় দমাদম লাথি মারতে লাগল আর মুখ দিয়ে – ওদের যা মানায় – সেই আমার মা বাবা তুলে অশ্লীল কথা বলতে লাগল। প্রথম প্রথম এসব দেখে শুনে রক্ত গরম হয়ে যেত। প্রতিবাদ করতাম, ঝগড়াও করতাম। কিন্তু এখন বুঝে গেছি – এইসব জানোয়ারদের কোনো কথার কোনো উত্তর দেওয়ার মানে হয় না। শুধু শুধু মন খারাপ হয়ে যায়। তাই ওদের দিকে না তাকিয়ে খুব জোরে

চালিয়ে দিলাম গাড়িটা। তারপর নো-এন্ট্রি বাঁচিয়ে এদিক ওদিক দিয়ে ঘুরিয়ে পিজি হাসপাতালের এমার্জেন্সি গেটে গাড়িটা ঢুকিয়ে, লক করে ওখানকার ফুটপাতের পাইস হোটেলে ভাত খেতে চললাম। আর পারছি না , ভীষণ খিদে পেয়েছে।

খাওয়া দাওয়া সেরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আরাম করে একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর ভেতরে এসে গাড়ির দরজা খুলে বসতে যাচ্ছি – দেখি একজন পুলিশ কনস্টেবল কোথা থেকে গাড়ির কাছে চলে এল। বলল –

- য়্যাই , গাড়ির কাগজ দে, লাইসেন্স দে। এটা গ্যারেজ নাকি ? গাড়ি রেখে বেড়াতে যাওয়া?

- কেন? এখানে নো-এন্ট্রি আছে নাকি?

- তা কেন থাকবে? রুগী নামিয়ে দিয়ে চলে গেলে কিছু হয় না। কিন্তু এখানে গাড়ি গ্যারেজ করে চলে যাওয়ার নিয়ম নেই। পাঁচশ টাকা ফাইন হবে। কাগজ বার কর শিগগির।

এখানে এরকম নিয়ম আছে নাকি? এখানে তো মাঝেমাঝে গাড়ি রেখে ওই পাইস হোটেলে খেতে যাই। কেউ তো কোনোদিন কিছু বলে না। তাহলে আজ এমন কি হলো ? কিন্তু মুশকিল হলো – এদের সঙ্গে বেশি কথা বলা মানে আরো দুএকজন পুলিশ ডেকে ওরা জোর করে কাগজপত্র সিজ করে নেবে, তারপর লম্বা চওড়া আরো দুএকটা কেস দিয়ে দেবে। কি যে বিপদ আমাদের! রাস্তায় ফাঁকা ট্যাক্সি দাঁড়াতে দেবে না। এখানে ফাঁকা জায়গা, একটু সময়ের জন্য গাড়ি রেখে খেতে যাওয়া যাবে না, তাহলে করবটা কী? সারাদিন শুধু গাড়ি চালিয়েই যাব? কোথাও দাঁড়াবো না ? খাবো না? আশ্চর্য ব্যাপার!

অগত্যা সেই পুলিশের সঙ্গে সন্ধি করতে হল। অনেক অনুনয় বিনয় করে বললাম যে খুব খিদে পেয়েছিল স্যার তাই একবার গাড়িটা রেখে পাঁচ মিনিটের জন্যে খেতে গিয়েছিলাম। আর তাছাড়া এখানে যে গাড়ি রাখা যায়না – এটা জানতাম ও না। অবশেষে দর কষাকষি করে পাঁচশো থেকে তিনশো – দুশো – একশো করে পঞ্চাশে রফা হল। পঞ্চাশ টাকা দিতে লোকটা কোথায় যেন চলে গেল। আমি মনে মনে অজস্র গালাগালি করলাম তাকে, সারাদিন এরকম হাড়ভাঙ্গা রোজগারের টাকা থেকে এরকম ভাবে টাকা নিল বলে।

মনের দুঃখে গাড়িটা স্টার্ট করে বেরোতে যাচ্ছি এমন সময় এক তরুণ ছুটতে ছুটতে এসে বলল –

- দাদা, পেশেন্ট আছে। বারাসাত যাব। একটু চলুন Please!

- কোথায় পেশেন্ট? বারাসাতের কোথায় যাবেন?

- ওই যে পেশেন্ট ওখানে বসে আছে, আমরা ওই ডাকবাংলোর মোড়ের কাছেই যাব নীলগঞ্জ রোডের ওপর, একটুখানি।

এতো দূরে ভাড়া যাবার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ছেলেটা এতো মিষ্টি করে অনুরোধ করল যে 'না' করতে পারলাম না।

তার ওপর পেশেন্ট যখন আছে - ! সামনের সিটে ছেলেটি উঠল। পেছনের সিটে উঠল ছেলেটির দাদা বৌদি , আর বৌদির কোলে একটা ছোট্ট সদ্যোজাত বাচ্চা। ছেলেটা আসলে ওই ভদ্রলোককে আর ভদ্রমহিলাকে দাদা-বৌদি বলে ডাকছিল, তাই বুঝতে পারলাম।

- দেখো, দেখো – সাবধানে, ওকে ঠিক করে ধরে রাখো। ওর মাথায় চাপ পড়ছে না তো? দেখো – নাকটা যেন ফাঁকা থাকে। ওই কাঁথা যেন মুখে চাপা না পড়ে যায়।

- আরে নিশ্চিন্ত থাকো, আমি তো দেখছি। সব ঠিক আছে।

- বৌদি, কিরকম জুলজুল করে দেখছে দেখো ও ! কী দেখছে এখন? ও কী বুঝতে পারছে কোথায় চলেছে ও? সুন্টু-পুটু? ও সুন্টু পুটু , এদিকে দেখো –

- হ্যাঁ, তুমিও যেমন! তুমি এখন ওকে ডাকছো – ও যেন তোমার কথা শুনতে পাচ্ছে ! এইসময় বাচ্চারা দেখতেও পায়না , শুনতে ও পায় না, এগুলো আস্তে আস্তে আসে।

- রমা, তোমার সেলাইয়ে চাপ পড়ছে না তো? গাড়ির যা জার্কিং !

একটু আস্তে চলুন ভাই! সবে অপারেশন থেকে উঠেছে !

- বৌদি, কি নাম রেখেছো গো পুঁচকেটার? আমি কিন্তু ওকে পুঁচকে বলেই ডাকব। একবার কোলে দেবে আমায়?

- আরে না না। তুমি ওই সিটে বসেছো, কী করে নেবে ? তাছাড়া রাস্তার হাত তোমার। বাড়ি গিয়ে হাত পা ধুয়ে বিছানায় বসবে, তোমার কোলে দেব। তবে তোমার কোলে হিসি করে দিতে পারে। তখন কী করবে ?

- সে কিছু হবে না। তাছাড়া ওই যে – কী যেন বলে – হাগিস পরিয়ে রাখবে তো !

- আচ্ছা, তোমাদের এত দেরি হল কেন বল তো? আমি তো সেই সকাল ন'টা থেকে রেডি হয়ে বসে আছি, তোমরা এতো দেরি করলে কেন?

নতুন বাচ্চার আগমনে নতুন দিনের সূচনা হয়েছে ওদের মনে। এরকম নির্ভেজাল আনন্দ দেখতে বড়ো সাধ হয়। এই যে ওদের দাদা-বৌদির সঙ্গে ওই ভায়ের এখন এত ভাব , এই ভায়ের বিয়ে হবার পরেও কি ওদের এত ভাব থাকবে? এরকম তো কতই দেখলাম। কেউ ভাবতেও পারে না যে একটা সুখের সংসারে কিভাবে নানারকম অশান্তি এসে আস্তে আস্তে ঢেকে যায় সমস্ত সুখের আকাশ। যতদিন না কোনো ছেলের বিয়ে হচ্ছে বা শুধু প্রথমজনের বিয়ে হচ্ছে – ততদিন অবধি সংসারে বেশ শান্তিই থাকে। কিন্তু তারপর অন্য বউয়েরা আসতে শুরু করলেই – আস্তে আস্তে অশান্তিও কোথা থেকে যেন চলে আসে। অবশ্য তাই বা বলছি কেন, ছেলেরা যদি সব ঠিক থাকে - তাহলে বাইরের মেয়েরা বউ হয়ে এসে আর কতটুকুই বা পাল্টাতে পারবে তাদের! আসলে কি হয়, আমার মনে হয় জয়েন্ট ফ্যামিলিতে সবাইকেই কিছু কিছু Sacrifice করতে হয়। সেটা একজন করলে হয় না। সবাইকেই করতে হয়। সেটা না করলেই আস্তে আস্তে অশান্তি শুরু হয়ে যায়।

বারাসাতে ওদের ছেড়ে দিলাম। যা ভাড়া হয়েছে তার থেকে কিছু বেশিই দিল। বলল – খুচরো না থাকে – এই টাকাটাই রেখে দিন। আমি বললাম ---

- না, না। ব্যালান্সটা আছে। দিচ্ছি, ধরুন।

---- আরে রাখুন না। না হয় মিষ্টি খাবেন, আজ একটা ভালো দিন। আমার প্রথম সন্তান এই প্রথম বাড়ি এল –

এরপর আর বলার কিছু থাকে না। সেই শিশুর সুস্থতার প্রার্থনা করে গাড়ি ঘোরালাম। একটু এগিয়ে এসে একটা চা-এর দোকানে দাঁড়ালাম। চা খেতে হবে।

চা টা শেষ করে গাড়ি নিয়ে একটু এগোতেই দেখলাম মাঝবয়সী ভদ্রলোক পাজামা পাঞ্জাবি পরা বেশ ধোপদুরস্ত চেহারা, সঙ্গে একজন শালোয়ার কামিজ পড়া বয়স পনেরো-ষোলোর কিশোরী। সেই বয়স্ক লোকটি মেয়েটির হাতটা শক্ত করে ধরে আছে।

- শোভাবাজার যাবে ?

- যাবো, উঠুন।

সকাল থেকে গরমটা আজ অতোটা ছিল না। কাল অত বৃষ্টি হয়েছিল তার জন্যেই মোটামুটি সকালটা বেশ শান্তিতে কেটেছে। এই এখন, বিকেলের পর থেকে যেন সেই ঠান্ডা ভাবটা উধাও হয়ে আবার ভ্যাপসা গরম ফিরে এসেছে। আকাশে মেঘ আছে। অসময়ের এই বিকেলেও বেশ সন্ধে সন্ধে মনে হচ্ছে।

গাড়িটা সবে মধ্যমগ্রাম মোড়ের কাছাকাছি এসেছে, পেছনের সিট্ থেকে কিরকম যেন অস্বস্তিকর শব্দ পেতে থাকলাম। অভ্যেসমতো চোখটা আয়না দিয়ে পেছনে চলে গেল। দেখলাম সেই ভদ্রলোক ওই মেয়েটার গা ঘেঁসে বসে ওকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছে আর মেয়েটা বারবার ওর হাতটা সরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু মেয়েটার আর সরে যাবার জায়গা নেই। একেবারে ধারে দরজার গায়ে লেপ্টে গেছে। মাথাটা বেশ গরম হয়ে গেল। কেউ কারোর ওপর এসব ব্যাপারে জোর করলে আমি দেখেছি

- আমার মাথাটা কিরকম যেন গরম হয়ে যায়। কিন্তু - আমায় তো মেয়েটা কোনো অভিযোগ জানায়নি। আমার কি কিছু বলা ঠিক হবে?

চুপচাপ আরো কিছুটা এগিয়ে গেলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখলাম – মেয়েটি বলে উঠল - আপনি হাতটা সরিয়ে আমার থেকে দূরে বসুন তো একটু। আপনাকে কাকু বলি। আপনি আমার সঙ্গে এরকম করছেন কেন?

আর কিছু বলার দরকার হল না। গাড়িটা সাইড করে থামিয়ে দিয়ে নেমে পেছনের দরজা খুলে লোকটাকে বললাম - নেমে আয় শালা, এটা ট্যাক্সি। এটা অসভ্যতা করার জায়গা নয়। নেমে আয় –

সেই লোকটা নেমে একটু চোটপাট করতে লাগল। কিন্তু আমি একটা চড় মারার মতো পোজ দিতেই দেখলাম পেছন ফিরে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। মেয়েটা বিব্রত এবং জড়োসড়ো হয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে থাকল। আমি তাকে বললাম –

– কোথায় যাচ্ছিল তোমরা শোভাবাজারে ? ওই বুড়ো কে হয়?

- শোভাবাজারে কোথায় মেয়েদের অনেক কাজ পাওয়া যায় - তাই কাকু নিয়ে যাচ্ছিল। না, আমার নিজের কাকু নয়। পাড়ার লোক। আমি চাকরির খোঁজ করছিলাম সবার কাছে, কাকু বলল - চল নিয়ে যাই শোভাবাজার। কোন সিনেমার পাশেই কি যেন একটা বাড়ি আছে বলেছিল, ওখানে নাকি গেলেই চাকরি পাওয়া যায়। তাই যাচ্ছিলাম। কিন্তু কাকু হঠাৎ ট্যাক্সিতে উঠেই কিরকম অসভ্যতা শুরু করে দিল।

আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। গরিব ঘরের কত অসহায় মেয়েরা এইভাবে বিক্রি হয়ে যায় রোজ, কে-ই বা তার হিসাব রাখে!

পাড়ার এরকম জেঠু-কাকুরা তো কম যান না এসব ব্যাপারে! নেহাৎ মেয়েটার কপালটা আজ ভালো ছিল, তাই হয়তো বেঁচে গেল। তবে, আজ ভালো ছিল বলে যে রোজই ভালো থাকবে – তা তো নয়। কী জানি – ওর কী হবে।

মেয়েটিকে বাস ভাড়া দিয়ে বললাম – যাও বাস ধরে বাড়ি ফিরে যাও। আর এরকম কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে কোনোদিন চাকরি খুঁজতে বেরিও না। ওই লোকটা তোমায় নিয়ে একটা খারাপ জায়গায় বিক্রি করে দিতে যাচ্ছিল। বুঝলে ?

মেয়েটি কী বুঝলো – কে জানে ! চোখটাকে বড়ো বড়ো করে কিছুক্ষন তাকিয়ে উল্টোপথে হাঁটা দিল।

ফাঁকা গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চললাম, কালিন্দীর মোড়ের কাছে দেখলাম ঠিক সিগন্যাল পোস্টটার পরেই একটা ছোটোখাটো জটলা। কী জানি কী হয়েছে। সিগনালটা লাল-ই যখন হয়ে আছে তখন যা হয় হোক, আমার তো আর কিছু করার নেই। হঠাৎ সেই জটলা থেকে তিন চার জন লোক ট্যাক্সি ট্যাক্সি করে আকাশ বাতাস মাতিয়ে তুললো। একজন অত্যুৎসাহী লোক আমায় দেখতে পেয়ে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে আমার কাছে এসে জানাল একটা Accident হয়েছে সামনে। একটা বাস একজনের পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে। এখুনি হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে।

এইরকম কোনো দরকারে আমার খুব অসুবিধে থাকলেও যাবার চেষ্টা করি। গেলাম ও। একজন বয়স্ক মানুষকে তিন চারজন ধরাধরি করে তুলল। তারপর নিজেরাও উঠল। বলল আর জি কর হাসপাতালে যেতে হবে।

আর জি করের এমার্জেন্সির সামনে দাঁড়ালাম। একজন ছুটে গিয়ে একটা ট্রলি ধরে আনল আর তারপর সবাই মিলে ভদ্রলোককে তাতে তুলে নিয়ে এমার্জেন্সির ভেতর ঢুকে গেল। এইসব ক্ষেত্রে যা হয় সাধারণত ঠিক তাই হল। তাড়াহুড়োতে কারোরই আর ট্যাক্সির ভাড়া দেবার কথা মাথায় থাকে না। এদেরও তাই-ই হল। আগে আগে বোকার মতো অনেক সময় বাইরে অপেক্ষা করে দু-তিনটে ভাড়া ছেড়ে দিতাম, এখন আর সে ভুল করি না। প্রথমেই যদি টাকা না দিয়ে ভেতরে চলে যায় - বুঝে নিই যে আমিও এদের মতো আজ একটু সমাজ সেবা করলাম।

হসপিটালের ভিজিটিং টাইম মনে হয় শেষ হয়ে গেল। অনেক লোকজন ওয়ার্ড থেকে দেখলাম বেরিয়ে আসছে। ভাবছিলাম – একটু চা খেতে পেলে বেশ হয়। কিন্তু কিছু সময় আগেই কিছু টাকা গচ্ছা দিয়েছি পুলিশকে, আর ভরসা পেলাম না এখানে গাড়ি রেখে চা খেতে যেতে। গরমে খুব ঘেমে গিয়েছিলাম। রুমাল দিয়ে মুখ হাত ভালো করে মুছে ফের ইঞ্জিন স্টার্ট করলাম। আকাশের দিকে চোখ পড়ে গেল। একটু বেশিই অন্ধকার মনে হল। তার মানে বেশ ভালোই মেঘ জমেছে। ভালোই বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে। আর তাছাড়া আজ যা গরম পড়েছে – বৃষ্টি হবেই।

দেখলাম এক মাঝবয়সী মহিলা অঝোরে কেঁদে চলেছেন আর তাঁকে সান্ত্বনা দিতে দিতে একজন বয়স্ক মানুষ আসছেন। ফাঁকা ট্যাক্সি দেখে – যাব কিনা জানতে চাইলেন। বললেন পানিহাটি যাবেন। অগত্যা একটু চা না খেয়েই প্যাসেঞ্জার তুলে নিয়ে ছুটতে হল।

ট্যাক্সির ভেতর বসে ভদ্রমহিলা আরো জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন। ভদ্রলোক তাঁকে যতই সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন – ততই তাঁর যেন কান্না বেড়ে যাচ্ছিল।

- আমার বাবুর কিছু হয়ে গেলে আমি কিন্তু কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারব না। ভগবান কেন যে আমায় এরকম বিপদ দিলেন – আমি জানি না, বুঝতে পারছি না। আমি তো জেনে বুঝে কোনোদিন কোনো অন্যায় করিনি। কারোর ক্ষতিও করিনি কোনোদিন। রোজ সকালে পুজো না করে জল খাই না। তবে আমার এরকম কেন হল বল তো ? কী অন্যায় করেছি আমি?

- আরে কী মুশকিল, তুমি অন্যায় করবে কেন? যার যা কপালে আছে, যা যা ভোগান্তি আছে – সে তো সব হবেই। আর ডাক্তার তো বলছেই – আটচল্লিশ ঘন্টা পার হলে বিপদ কেটে যাবে। এখন শুধু মন দিয়ে ভগবানকে ডাকো যেন এই আটচল্লিশ ঘন্টা ভালোয় ভালোয় পেরিয়ে যায়। আমারও কি চিন্তা হচ্ছে না? কিন্তু চিন্তা করেই বা কী করব বলো তো? আর তাছাড়া তুমি যেরকম কান্নাকাটি করছ - এতে তো তোমারই শরীর খারাপ হয়ে আরো গন্ডগোল হয়ে যাবে। তখন আমি না পারব এদিক দেখতে, না পারব তোমায় দেখতে, আর আমারও তো বয়স হয়েছে। এরকম কান্নাকাটি কোরো না তো!

মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। সত্যি, এই বৃদ্ধ বয়সে এরকম মনের ওপর চাপ এরা কিভাবে সামলাবে? এদেরই তো এখন শুয়ে বসে থাকার কথা। ছেলে, ছেলের বৌ এর আদর যত্নে থাকার কথা। তা নয়, এখন ছেলেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত দুজনেই। বড়ো মায়া হল এদের দুজনকে এইভাবে দেখে।

- শোনো, এমাসে এখনও আমার পেনশন ঢোকেনি ব্যাংকে, কেন বলো তো ? কখন ওখানে খোঁজ নিতে যাই বল তো?

বুঝলাম না, অন্য কথা বলে স্ত্রীর মনটা অন্যদিকে করে দিতে চাইছেন বলেই কি এখনই পেনশনের কথাটা তুলতে হল? দেখলাম ভদ্রমহিলাও কান্না ভুলে বলছেন –

– সেকি গো? এত খরচ খরচার মাঝে পেনশনে গন্ডগোল হলে তো একেবারে সোনায় সোহাগা ! কী মুশকিল বলোতো? কাল সকালে একবার ব্যাংকে গিয়ে খোঁজ নাও। আচ্ছা, লাইফ সার্টিফিকেট ঠিকমতো জমা দিয়েছিলে তো? তোমার যা ভুলো মন!

দুজন প্রৌঢ় মানুষ, তাদের নিজস্ব জগৎ নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। আমার হঠাৎ নিজের বাবা-মা র কথা খুব মনে পড়ে গেল। মায়েরা এরকমই হয় মনে হয়। নিজে না খেয়ে মা কতদিন আমায় ভালো করে খাইয়েছে – আমি জানতেই পারিনি কোনোদিন। কতদিন সন্দেহ হলে জানতে চাইতাম – মা, তুমি খেলে না তো? - মা বলত – কী জানি, কিরকম অম্বল হয়েছে মনে হচ্ছে রে, আজ আর কিছু খাবো না। শুধু জল খেয়ে শুয়ে পড়লে - ভালো হয়ে যাবে। আমার গ্র্যাজুয়েশন পরীক্ষায় ফর্ম ফিলাপ করার সময়ে মা তার শেষ সম্বল কানের দুল দুটো বাড়ির পাশের কেষ্ট স্যাকরাকে বিক্রি করে দিয়ে আমায় টাকা দিয়েছিল। আমি তখন জানতেও পারিনি। পরে একদিন নজরে পড়তে জানতে চেয়েছিলাম – মা তখন সোজাসুজি উত্তর দেয়নি, বলেছিল – কী আর হবে বলত এই বয়সে দুল পরে। তার চেয়ে তুই ভালো করে মানুষ হ। ভালো চাকরি বাকরি কর, তারপর না হয় আমায় একটা গড়িয়ে দিবি, বুঝলি? - বড়ো দুঃখ হয়, মা-এর সেই প্রত্যাশা পূর্ণ করতে আমি পারিনি। গ্র্যাজুয়েশন করেছি, কিন্তু চাকরি পাইনি, ট্যাক্সি চালাচ্ছি। তাও যখন ট্যাক্সি চালিয়ে দু পয়সা আয় করছি, তখন আর মা নেই। আমায় এই বিরাট পৃথিবীতে একেবারে একা করে দিয়ে মা তখন চলে গেছে একেবারে। বাবা যখন মারা গেছে – খুবই ছোট ছিলাম আমি। সেরকম মনেও নেই। মা যে তারপর কীভাবে আমায় নিয়ে এক এক দিন কাটিয়েছে – তা ভাবা যায় না। দু বাড়িতে রান্নার কাজ করত মা। সকালে এক বাড়ি, সন্ধেতে আর এক বাড়ি। তারপর রাতে বাড়ি ফিরে আমাদের দুজনের

রান্না হতো – রাতের খাবার আর পরের দিনের সকালের খাবার। শুনেছিলাম দাঙ্গার সময়ে খুলনার বাড়ি ছেড়ে এক কাপড়ে দুজনে আমায় নিয়ে রাতের অন্ধকারে হেঁটে হেঁটে বর্ডার ক্রশ করে এই দেশে চলে এসেছিল। আমাদের নাকি ওখানে পাকাবাড়ি ছিল, দোতলা। বাগান ছিল, চাষের জমি ছিল। আরো কত কী ছিল শুনেছি। মা নাকি ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে আমাদের চাষের ধান ভেঙে চাল করত। হাঁস ছিল গোটা দশেক, তারা পাশের খালে সারাদিন চরে বেড়াত। বাড়িতে নাকি দুটো গরুও ছিল।

পুরোনো দিনের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। এই ভদ্রমহিলাকে দেখে আমার নিজের মা'র কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মনে হয় – পৃথিবীর সব মা –ই বোধহয় একইরকম। তাদের দেখতে হয়তো আলাদা হয় , ভাষাও হয়তো তফাৎ হয় কিন্তু সবাই সেই চিরন্তন মা-ই হয়!

- এই ডানদিকে ঢুকুন ভাই – এই গলিটা – হ্যাঁ, ঢুকুন, ভালো রাস্তা, কোনো অসুবিধে নেই।

ভদ্রলোকের কথায় চিন্তায় ছেদ পড়লো। সরু একটা গলিতে গাড়ি ঢোকালাম। কিছুটা যাবার পর দাঁড়াতে বললেন ভদ্রলোক। ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। তারপর আমি একটু রাস্তার এদিক ওদিক তাকাচ্ছি দেখে বললেন – এই সামনেই একটা মাঠ আছে। ওখানে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিতে পারবেন। কোনো অসুবিধে হবে না। ঠিক আছে? আচ্ছা ধন্যবাদ ভাই !

বুঝলাম ভদ্রলোক শুধু বুদ্ধিমান নয়, বেশ ভদ্রও।

ফাঁকা রাস্তায় কিছুদূর আস্তে আস্তে দেখলাম তেলেভাজার দোকান। গরম গরম তেলেভাজা ভাজছে। দু-একজন তেলেভাজা নেবে বলে দাঁড়িয়েও আছে। পাশেই একটা চায়ের দোকানও আছে। হঠাৎ খিদেটা বেশ জেগে উঠল। মনে পড়ল সেই দুপুরে একটু ভাত খেয়েছি। এখনও কিছু খাওয়া হয়নি। এমনকি একটু চা-ও খাওয়া হয়নি। তাই সুবিধেমতো জায়গায় গাড়িটা পার্ক করিয়ে তেলেভাজা মুড়ি কিনে খেলাম, তারপর আয়েশ করে একটু চাও খেলাম। কিন্তু চা শেষ হবার আগেই তাড়া শুরু হয়ে গেলো। প্যাসেঞ্জার এসে গেছে। ওরা হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরবে। হাতে বেশি সময় নেই। এক ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা আর এক বাচ্চা।

ভদ্রলোক মালপত্র সমেত গাড়িতে উঠেই প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থা, বললেন –

ভাই খুব বিপদ হয়ে গেছে। বাড়ি থেকে বেরুতেই এত দেরি হয়ে গেল। দশটা পনেরোতে ট্রেন হাওড়া থেকে। এখন প্রায় ন'টা বাজে। আমাদের পৌঁছে দিতে হবে।

আমি দেখলাম বাজে কথা বলে লাভ নেই। বৌ বাচ্চা নিয়ে, এত মালপত্র নিয়ে কিছুতেই একঘন্টার মধ্যে হাওড়া স্টেশন এ পৌঁছনো যাবে না। বড়বাজারে নির্ঘাত জ্যাম পাবো। মাঝরাস্তায় থাকাকালীন ট্রেন বেরিয়ে যাবে। ভদ্রলোককে তাই বোঝালাম যে হাওড়া যেতে যেতে ট্রেন বেরিয়ে যাবে। বিপদে পড়ে যাবেন। তার চেয়ে বরং বাগবাজার লঞ্চ ঘাটে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব নামিয়ে দিচ্ছি। লঞ্চে গঙ্গা পেরিয়ে চলে যান। তবু পৌঁছে যাবার একটা চান্স আছে। অবশ্য বিটি রোড যদি ফাঁকা পাই !

ভদ্রলোক নতুন প্রপোজালটা প্রথমে ভালো মনে নিচ্ছিলেন না। কিন্তু চিড়িয়ামোড় পেরুতেই যখন সাড়ে ন'টা বেজে গেল তখন বাগবাজারের লঞ্চ ঘাটেই যেতে রাজি হয়ে গেলেন। যত জোরে সম্ভব গাড়ি চালিয়ে পৌনে দশটার মধ্যে লঞ্চঘাট পৌঁছে দিলাম। বললাম --- কপালে থাকলে ট্রেন পেয়ে যাবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যান।

একটা ফোন আসছিল বারবার। তখন এতো জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলাম যে ধরার সুযোগ পাইনি। এখন সেই নাম্বারে ফোন করলাম। যা শুনলাম তাতে মনটা বেশ খুশিতে ভরে গেল। প্রথমে তো বুঝতেই পারছিলাম না – কে বলছে, কি বলছে। পরে মনে পড়ল – দিন সাতেক আগে একটা ইয়ং মেয়ে শিয়ালদহ স্টেশন যাবে বলে ট্যাক্সিতে উঠেছিল। কিন্তু নামার সময়ে দেখে ওর ব্যাগের মধ্যে ওর টাকা পয়সার পার্সটা নেই। চুরি হয়ে গেছে না কি ও নিজেই হারিয়ে ফেলেছে বুঝতে পারছিল না।

আমার কাছে প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে পুরো ঘটনাটা বলে আমার ফোন নম্বরটা নিয়েছিল। বলেছিল ও কৃষ্ণনগরে থাকে, মাঝে মাঝে কাজের জন্য কলকাতায় আসে। এও বলেছিল যে পরে যেদিন আবার কলকাতায় আসবে আমায় ফোন করে দেখা করে টাকাটা দিয়ে দেবে।

এরকম অবশ্য অনেকেই হয়তো বিপদে পড়ে বলে চলে যায়, কিন্তু তারপর যথারীতি সব ভুলেও যায়। কিন্তু এই মেয়েটি নিজের থেকে ফোন করে বলল যে আগামী কাল ও শিয়ালদহ আসবে বেলা দুটো নাগাদ। তারপর আমার সঙ্গে দেখা করে সেদিনের ভাড়ার টাকাটা দিয়ে দেবে।

টাকাটা খুব বড়ো ব্যাপার নয়। কিন্তু এরকম মানুষও যে এখনও আছে – এটা জেনেই ভীষণ ভালো লাগল। মনটা খুশিতে ভরে গেল। আচ্ছা, ওই মেয়েটিকে কিরকম যেন দেখতে? মুখটা তো ঠিকমতো মনেও পড়ছে না। ভালোই হবে। নিশ্চয়ই পবিত্র একটা মুখ। যারা এরকম সৎ মানুষ হয় – তাদের মুখে নিশ্চয়ই একটা পবিত্রতার ছাপ থাকে। আচ্ছা, কাল যে করেই হোক ওই সময়ে শিয়ালদহে অপেক্ষা করতে হবে। না, না, ঠিক টাকার জন্য নয়। ওই মেয়েটিকে ভালো করে দেখতে হবে। ওকে নিশ্চই আমার মায়ের মতো দেখতে হবে। সৎ, পবিত্র, নির্লোভ একটা মুখ। আচ্ছা, ও কি বিবাহিত ? – কি দরকার সেসবে তোর? তুই কি ওকে নিয়ে অন্য কিছু ভাবছিস নাকি ? – মনের ভেতর এরকম প্রশ্ন – উত্তর চলতেই থাকল।

আজ আর ভাড়া খাটব না। আজ আমার মন খুশিতে ভরে আছে, আজ আর কিছুর প্রয়োজন নেই।

গ্রাম বাংলার বিলীয়মান শিল্পচর্চা

ডঃ প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

গ্রাম বাংলার অনবদ্য সৃজনশীলতার উদ্ভাস সুদূর অতীত থেকেই পরম্পরাক্রমে চলে আসছে। অনুপম ভাস্কর্য্যের নিদর্শন সারারাজ্য জুড়েই লক্ষ্য করা যায়। তেমনভাবে প্রচারের আলোতে আসতে পারেনি বলে হয়ত শিল্পীদের অনেকেরই মধ্যে এই সব অনন্যসাধারণ সংস্কৃতি থেকে কিছুটা উদাসীন মনোভাব ইদানিং দেখা গিয়েছিল। এই সংকটকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে সম্প্রতি ইউনেস্কো হাত মিলিয়েছে বাংলার কিছু সাবেক শিল্পের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে। স্বীকৃতিপ্রাপ্তির ফলস্বরূপ কয়েকটি অগ্রগণ্য ঐতিহ্যময় শিল্প যেমন শোলাশিল্প, পাটিবেত ও মাদুর শিল্প, কাঁসা-পিতল ও ডোকরাশিল্প, মুখোশ, পটচিত্র, টেরাকোটা, লাক্ষাশিল্প ইত্যাদি বিকাশের সম্ভবনার প্রেক্ষিতে শিল্পীরা আগ্রহান্বিত বোধ করছে ও এক আশার আলো দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি আবার জি. আই বা জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকর শিরোপা পাওয়ায় গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হচ্ছে।

শোলা: গ্রামবাংলার জলাভূমিতে অনাদর ও অযত্নে বেড়ে ওঠে শোলা গাছ। যদিও কিছু জায়গায় এর চাষও শুরু হয়েছে সম্প্রতি। বৃষ্টির মরসুম শেষেই এই গাছের কান্ড কেটে শুকিয়ে নিয়ে রাখলেই হলো। ধারালো একটি ছুরি দিয়ে এই কাণ্ডের ছাল চেঁচে নিলেই শ্বেতশুভ্র শোলা পাওয়া যায়। মালাকার শিল্পীদের নিপুন হাতের পরশে তৈরী হয়ে যায় একের পর এক নান্দনিক ভাস্কর্য্য। পূর্ব বর্ধমান জেলায় বনকাপাসি পঞ্চায়েতের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে 'শোলা হাব'। প্রতিমার সাজ তৈরিতেই কেবল নয়, হিন্দু বিবাহ অনুষ্টানের আঙ্গিক টোপর ও মুকুট তৈরিতে শোলা ছাড়া চলবেই না। বিভিন্ন ধরণের টুপি তৈরিতে, ঘড়ি সার্ভিসিং-এর যন্ত্রাংশ পরিষ্কার করতে শোলার সূক্ষতা ও আকর্ষণ শক্তির প্রয়োগ চাই। কতরকম ঘর সাজানোর জন্য, নকশা ফুটিয়ে তোলার জন্য শোলার ব্যবহার সর্বজনবিদিত।

পাটিবেত: জলাভূমিতে বেত গাছ বেড়ে ওঠে। উত্তরবঙ্গের জলবায়ুতে তা আরও ভালো হয়। কুচবিহার জেলার ঘুঘুমারিতে শীতলপাটি, আসন, টেবিল ম্যাট, দেওয়ালে সাজানো নক্সী ডিজাইন ইত্যাদি অনবদ্য নকশায় ফুটিয়ে তোলা হয়। এই শিল্পের মূল উপাদান পাটিবেতের চাষ উত্তরবঙ্গের কুচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় খুব ভালো হয়। এই পাটিবেতের সাথে পূর্ব মেদিনীপুরে সবং, নারায়ণগড় ও সন্নিহিত জায়গায় মাদুরকাঠির চাষ হয় যা দিয়ে স্থানীয় শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতায় মাদুর বুনে থাকেন। মাদুরকাঠি জি. আই শিরোপা ও নিজস্ব লোগো পাওয়ায় আন্তর্জাতিক বিপণনের ক্ষেত্রেও এবার সুবিধা পাওয়া যাবে।

কাঁসা শিল্প : মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া ও নদীয়া জেলার মুড়াগাছা-বেথুয়াডহরী, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর এই জায়গাগুলিতে বিশেষ করে কাঁসা শিল্প অগ্রগণ্য। এই প্রাচীন শিল্পটাই একটু বিস্মৃতপ্রায় হতে বসেছে, কারণ স্টীল ও প্লাস্টিক/মেলামাইনের যুগে এর ব্যবহার কিছুটা হলেও কমে আসছে। ঐতিহ্যমন্ডিত কাঁসা তৈরিতে দরকার

হয় তামা ও টিন (৪:১ অনুপাতে) – টিনকে অনেকে রাং-ও বলে থাকেন স্থানীয়ভাবে। মঙ্গলঘট , পিলসুজ,পূজার বিভিন্ন উপকরণে পিতল, কাঁসার ব্যবহার আজও অটুট আছে। থালা, বাটি , গ্লাস ইত্যাদি তৈরির জন্য যে শৈল্পিক দিক আছে তা পরম্পরাগত ভাবেই চলে আসছে – বিভিন্ন ফুলদানী, দেওয়ালে সাজানোর – খোদাই করা কাজের দক্ষতার বিবরণ তেমনভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি এখনও। যেহেতু এইসব শিল্পীদের সন্তান-সন্ততিরা অনেকেই পরিশ্রমসাপেক্ষ শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেনা বলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যেভাবেই হোক, অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া থেকে গ্রামবাংলার এই কাঁসা-পিতল শিল্পকে স্থানীয় মানুষের জীবিকার সাথে যুক্ত করতেই হবে ও সেইসাথে বিপণনেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার।

ডোকরা: বাঁকুড়া জেলার শহরের উপকণ্ঠে বিকনা একটি ছোট্ট গ্রাম – মোট পরিবার ১০০রও কম হবে মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ দপ্তর গ্রামীণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন ডোকরা কুটির শিল্পকে আয়ের উৎস হিসাবে। বিশ্বের বাজারেও সমাদৃত হচ্ছে বাঁকুড়ার বিকনায় ডোকরা বিভিন্ন ধরণের গহনা ফ্যাশনে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে ইতিমধ্যেই।

কাঠের মুখোশ ও টেরাকোটা: দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমুন্ডি ব্লকে কাঠের মুখোশও জি.আই ট্যাগ পেয়েছে। এছাড়া বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের কাছে পাঁচমুড়াতে টেরাকোটার বিভিন্ন সামগ্রী – পোড়ামাটির হস্তশিল্প মল্লরাজাদের সময় থেকেই চলে আসছে। ওখানকার বিভিন্ন মন্দির, রাসমঞ্চতে এই টেরাকোটার প্রতিফলন দেখা যায়। পাঁচমুড়ার ঘোড়া ও হাতি প্রকৃত অর্থেই অপরূপ ভাস্কর্য্যের নিদর্শন।

লাক্ষা শিল্প : পুরুলিয়া জেলায় ঝালদা ব্লকে লাক্ষা শিল্পের প্রসার ব্যাপকতা লাভ করেছে সম্প্রতি। শ্রী জয়দেব মাহাতো – স্থানীয় এক কৃষক-বিজ্ঞানী ঝাড়খণ্ডের রাঁচি শহরে লাক্ষা গবেষণা ও সম্প্রসারণের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত থেকে লাক্ষা কীট পালনে দক্ষতা অর্জন করেছেন ও সেখানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গ্রামীণ যুবক-যুবতীদের লাক্ষা চাষে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন (পরজীবী এই কীট কুল,কুসুম ও পলাশ গাছ ছাড়াও সেমিয়ালতা গাছে আশ্রয় নেয় ও লাক্ষা উৎপাদন করে)। কাঠের পালিশ তৈরিতে লাক্ষার প্রয়োজন বিশেষভাবে স্বীকৃত। সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারত লাক্ষা চাষে সবচেয়ে অগ্রণী দেশ। ঝাড়খণ্ডের পরেই পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় লাক্ষার গুণমান খুব উঁচু ও তাই চাহিদাও প্রচুর। জয়দেববাবুর মতো আরও কয়েকজন সফল লাক্ষাপ্রেমী উঠে আসুক ও এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করুন।

শেষের কথা : গ্রামীণ শিল্প আমাদের সম্পদ। এই অতিমারীর পরবর্তী সময়ে শিল্পীদের কর্মোদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁদের পেশার প্রতি কতটা নিষ্ঠাবান – তাঁদের এই সময়ে বিষম পরিস্থিতিতে যথাযথ সময় ও শ্রম দান করে গ্রামীণ শিল্পীরা নিজ নিজ শিল্পকে রাখার চেষ্টা করছেন শ্রমদানই তা প্রমান করে। তাইত তাঁরা বাংলার শিল্পচর্চার উজ্জীবনী শক্তি। মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা তৈরির কাজ অক্ষুন্ন রাখছেন ও সেইসাথে তার অনুষঙ্গের উপকরণ যোগান শোলা শিল্পীরা। বিবাহ অনুষ্ঠানও বন্ধ থাকছে না পুরোপুরি এই অতিমারীর পরবর্তী সময়ে – দানসামগ্রী হিসাবে কাঁসা-পিতলের সম্ভার যোগানের চেষ্টা করছেন নিযুক্ত শিল্পীরা। আশা রাখবো এর ফলে সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির আর্থসামাজিক বিকাশ সুগম হবে ও সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ইউনেস্কোর স্বীকৃতি সুনিশ্চিত করবে সংশ্লিষ্ট সমস্ত মানুষের জীবিকা ও সেইসাথে বাঁচিয়ে রাখবে গ্রাম বাংলার অনুপম ভাস্কর্যগুলিকে।

শোলার দেবী মূর্তি

কাঁসার শিল্প নিদর্শন

কাঁসা শিল্পের বিবিধ নিদর্শন

ডোকরা শিল্প নিদর্শন

জেলাভিত্তিক শিল্পকেন্দ্র

ভেজালের অদৃশ্য জাল

ডঃ রজত তরাত

আমাদের পূর্বপুরুষেরা সত্যিই ভাগ্যবান ছিলেন – খাঁটি তেল, খাঁটি দুধ, টাটকা মাছ-মাংস, নির্ভেজাল শাক-সব্জি খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন। আজকালকার ভেজাল খাদ্যের পাল্লায় তাঁদের পড়তে হয়নি। আর বর্তমান প্রজন্মের তো ভেজাল খেয়ে খেয়ে শরীরের অঙ্গগুলো হয়ে পড়েছে দুর্বল – প্রয়োজন বাড়ছে ঔষধ-পত্রের, ডাক্তারের। নকল ঔষধেও ছেয়ে গেছে বাজার। কোনটা আসল, কোনটা নকল – এ যেন বিরাট এক ধাঁধা। কোথায় যেন পড়েছিলাম, ' অসুখ করলে ডাক্তারের কাছে যান, 'প্রেসক্রিপশন' নিন ও ওনার 'ফিস' টা দিন কারণ ওনাকে বাঁচতে হবে ; তারপর প্রেসক্রিপশনটা দেখিয়ে কেমিস্ট-এর দোকান থেকে ঔষধগুলো নিয়ে ওনার 'পেমেন্ট' করুন – কারণ ওনাকেও তো বাঁচতে হবে ; এবার দোকান থেকে বেরিয়ে ঔষধগুলো কোন এক 'ডাস্টবিনে' ফেলে দিন –কারণ আপনাকেও তো বাঁচতে হবে !' বুঝুন ব্যাপারটা – আমরা কোথায় আছি !

আমাদের দেশে জনসংখ্যা এত হু হু করে বাড়ছে যে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি – যেন তেন প্রকারেন ! আর এই মডার্ন এগ্রিকালচারের দৌলতে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদির ব্যবহার প্রচন্ড ভাবে বেড়েছে। চাষীরা পোকামাকড়ের হাত থেকে ফসল বাঁচাতে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করছে কীটনাশক। এগুলো ব্যবহারের কিছু নিয়ম আছে ; ফসল অনুযায়ী প্রত্যেকটি কীটনাশকের একটা ডোজ আছে. আছে একটা 'ওয়েটিং পিরিয়ড'। এগুলো না-মানার জন্যেই ঘটে যত বিভ্রাট। শাক-সব্জি, চাল-ডালে থেকে যায় 'পেস্টিসাইড রেসিডিউ ' – যা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এই 'পেস্টিসাইড রেসিডিউ ' মানুষকে স্লো পয়জন করে চলেছে। মিনারেল ওয়াটার এবং কোল্ড-ড্রিংকসে' 'পেস্টিসাইড রেসিডিউ'-এ ঘটনা নিশ্চয়ই অজানা নয় আজ কারো কাছে। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলাটা কোন ব্যাপারই নয় যেন আজকাল। পুরোনো কাগজ ঘাঁটলে দেখা যায় ভেজাল সর্ষের তেল কত লোককে পঙ্গু করে দিয়েছিল, আবার এই ভেজাল সর্ষের তেলই গল –ব্লাডার ক্যান্সারের অন্যতম কারণ বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন(ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,আমেদাবাদ ৭-১২-৯৩) – আর এখনো যে হচ্ছে না তাও কি হলফ করে বলতে পারি !আসলে ভেজালের জালে আমরা কিন্তু আটকে আছি, যা আমরা সবসময় বুঝতে পারছি না।

অন্য ভেজালের কথা থাক, এখন বরং আমরা শুধু রাসায়নিক ভেজালের কথাই বলি, যা নিয়ত আমাদের শরীরে ঢুকে যাচ্ছে খাদ্যের মাধ্যমে। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, জার্নাল এ চোখ রাখলে মাঝে মাঝেই এসব খবর চোখে পড়ে। আমরা সাধারণ লোকেরা এসবের খু-ও-ব একটা গুরুত্ব দিই না কারণ এই সব ভেজাল বা 'পেস্টিসাইড রেসিডিউ' কিন্তু সাধারণত প্রত্যক্ষভাবে প্রাণ সংহার করে না – ধীরে ধীরে নানা ধরণের অসুখ বিসুখ ঘটায়। আসা যাক রঙের কথায়। আলকাতরা থেকে জাত জলে দ্রাব্য মাত্র আটটি (কারো মতে দশটি) কৃত্রিম রঙ এদেশে খাদ্যে ব্যবহারের জন্যে আইনত স্বীকৃত। এগুলো হল – লাল রঙের জন্য Poncean 4R, Carmoisine এবং Erythrosine, হলুদ রঙের জন্য Tartrazine, Sunset yellow নীল রঙের জন্য Indigo, Carmine এবং Brilliant Blue সবুজ রঙের জন্য FCF - এই মোট আটটি কোল্টার ডাই। এই আটটি কৃত্রিম রঙ সরকারি মতে গ্রাহ্য বলেও তা বাতিল করে সেই জায়গায় স্থান পাওয়া উচিত প্রাকৃতিক রঙের। প্রাকৃতিক রং

হিসাবে নিম্নলিখিত জৈব রাসায়নিক যৌগ (প্রকৃতি থেকে রং সংগৃহিত অথবা বিক্ষনাগারে সংশ্লেষিত) আইনত গ্রাহ্য।হলুদ রঙের জন্য curcumin(রান্নার – হলুদের রাসায়নিক), জাফরান, রিবোফ্লাভিন এবং Anatto (Arnotto গাছের বীজের খোসা থেকে প্রাপ্ত হলুদ রঙ), সবুজ রঙের জন্য ক্লোরোফিল, ব্রাউন রঙের জন্য ক্যারামেল এবং লাল রঙের জন্য beta Carotene সহ অন্যান্য ক্যারোটিন যৌগ।

'কিশোরী' নামে একটি রঙের প্যাকেট পাওয়া যায় বাজারে। যে কোন অনুষ্ঠানে রান্নার ঠাকুরের ফর্দে 'কিশোরী' থাকবেই – আর 'কেশর' নামক মসলাবাচক শব্দটির সঙ্গে ধ্বনি সাদৃশ্যের কারণে আমরা কম মাথা ঘামানো জনগণ ওটা কিনছি এবং ব্যবহার ও করছি। বিরিয়ানি, পোলাও , বোঁদে, জিলিপি ইত্যাদিতে হলুদ রঙ করতে এটা ব্যবহার করা হয়। হলুদ ডালকে আরো ঝকঝকে হলুদ করতে এর জুড়ি নেই। এই 'কিশোরী' হল আলকাতরাজাত 'মেটানিল ইয়েলো'। এই প্যাকেটের গায়ে কিন্তু খু-ও-ব ছোট্ট করে লেখা থাকে 'নট ফর হিউম্যান কনজাম্পশন'। কিন্তু কারো হুঁশ নেই যে এই রঙ ক্যান্সার বাঁধাতে পারে, চোখ ও চামড়াকে খারাপ করতে পারে। জ্ঞানে-অজ্ঞানে আপনিও খাচ্ছেন, আমিও খাচ্ছি, আমলা-মন্ত্রী সবাই খাচ্ছেন। কিন্তু প্রকৃত কেশর বা জাফরান বড়ই মহার্ঘ। কাশ্মীরের Crocus sativus L. নামক উদ্ভিদের ফুলের গর্ভকেশরের উপরের অংশ থেকে তা নিষ্কাশিত হয়। এর সুগন্ধি কমলা রঙের উপাদান রুচিবর্ধক ও নানা ঔষধ-গুন্ সম্পন্ন।

এছাড়া বেশ কিছু মারাত্মক রং আমরা রাস্তার শরবত, লজেন্স, সস্তার আইসক্রিম, মিষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়মিত খাই। যে কোন বড়ো শহরে বাজারে গেলেই দেখা যায় পাবদা, লটে, মৌরলা ইত্যাদি ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মাছগুলিকে রক্তাভা দেওয়ার জন্য এগুলিকে লাল রঙে চোবানো হচ্ছে। বাজার-সংলগ্ন মুদির দোকান গুলিতে এই মাছের রঙ পাওয়া যায়। রঙের নাম 'কামধেনু' . আসলে ওটা 'রোডামিন-বি' কিংবা বিষাক্ত সুদান রেড। এই রং মাছের উপরিভাগের কোষে ঢুকে যায়। ধুলেও এ রং যায় না। পটল, উচ্ছে, ঝিঙে এসব সব্জিকে মারাত্মক সবুজ রঙ 'ম্যালাকাইট গ্রীণ' কিংবা তুঁতে জলে চোবানো হয় বাজারের মধ্যেই। যে যা খুশি করছে। চালে 'ইউরিয়া' দিয়ে মুড়ি ভাজছে সাদা করার জন্য ; পচনের হাত থেকে বাঁচাতে চাষীরা আলুতে গ্যামাক্সিন পাউডার মাখিয়ে সংরক্ষন করে থাকেন। কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট এর এক প্রাক্তন এমেরিটাস মেডিকেল সায়েন্টিস্ট –এর মতানুযায়ী এবং বিদেশের জার্নালে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানাই – গ্যামাক্সিন বা বি.এইচ. সি ইঁদুরকে কয়েকমাস খাইয়ে বিজ্ঞানীরা লিভার ক্যান্সার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। দুধে জল মেশানো তো কোন ব্যাপারই না – এটা আম জনতা মেনে নিয়েছে। কিন্তু চিন্তা করুন দিল্লির সেই সিনথেটিক মিল্কের কেলেঙ্কারিটা ? দুধ ভেবে জনসাধারণ যা খেল, সেটা দুধই না – ইউরিয়া, লিক্যুইড ডিটারজেন্ট, চিনি, একটু বনস্পতি তেল এবং জল দিয়ে তৈরি ঠিক দুধের মতো দেখতে 'সিনথেটিক দুধ'।

বলুন, কি করে আমরা নিশ্চিন্ত হই যে আমরা ও এটা খাচ্ছি না ? এবারে আসা যাক দুধ ও হরমোনের ব্যাপারে। কোন কোন গোয়ালারা দুগ্ধৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এই আশায় দিনে অন্ততঃ দু'বার গাভীদের শরীরে 'অক্সিটোসিন' ইনজেক্ট করে। অক্সিটোসিন কিন্তু দুধের পরিমান বাড়ায় না অথবা বলা ভালো বাড়াতে পারে না – কেবল দুগ্ধাশয়কে উত্তেজিত করে দুধের ধারা দ্রুততর করে। যে হরমোন সারাজীবনে খুব বেশী হলে একবার অল্প পরিমানে প্রয়োগই যথেষ্ট , সেই হরমোন দিনে দু'বার করে ব্যবহার করায় গাভীদের শরীরের প্রচন্ড ক্ষতি হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, অক্সিটোসিনের বার আষ্টেক ব্যবহারেই দুগ্ধাশয়ের আশেপাশের ক্যাপিলারিস গুলো ফেটে চৌচির হয়ে যায় এবং দুধে রক্ত মিশবেই মিশবে। দুধ

ফোটানোর পরও দুধ অক্সিটোসিনের প্রভাবমুক্ত হয় না এবং মূল দুধে যদি অক্সিটোসিন থাকে তাহলে সেই দুধও skimmed milk, tonned milk, pasteurized milk প্রভৃতিতে অক্সিটোসিন থাকবে। এই হরমোনের প্রভাবে নারীদের মুখে লোম বৃদ্ধি পায়, ঋতুচক্র অনিয়মিত হয় এবং স্তনগ্রন্থির পার্শ্ববর্তী ক্যাপিলারিস গুলো দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে অক্সিটোসিন ঘটায় পুরুষত্বহীনতা এবং বহুমূত্র। বয়স নির্বিশেষে নারীপুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই অক্সিটোসিন দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণতর করে এবং শ্রবণ ক্ষমতার হ্রাস ঘটায়। জ্ঞানে-অজ্ঞানে এই ভেজালের জালে আপনি-আমি সবাই বন্দি। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা কম – বিশেষত ভেজালের কারবার মানে যখন বিস্তর টাকার খেলা। খাদ্য ও পানীয়ের গুণমান তদারকির যথাযথ আয়োজন এবং অপরাধীর কঠোর শাস্তির বন্দোবস্ত না হলে এর কোন সুরাহা নেই। সুতরাং খাওয়ার ব্যাপারে একটু সতর্ক হতে হবে – খাওয়া শুধু খিদে মেটাতে নয়, পেট ভরাতে নয়, পুষ্টি সঞ্চয় করতে এবং সুস্থ সবল থাকতে – এ কথা বুঝতে হবে। ভেবে দেখুন আপনি কি বাঁচার জন্য খাচ্ছেন?

Millets- The Healthy Superfood

Dr. Mrinmoy Dutta

Recently, Finance Minister, Govt. of India announced that the year 2022-23 would be the International Year of Millets. India being the largest global producers of millets, had an essential role to play in Indian Cuisine but it is being gradually replaced by other cereals, *viz.*, rice and wheat. Of late a major comeback of millets is noted with the incorporation of millets in our diet. Ancient grains like Ragi, Jowar, Bajra, Amaranth, Barley and Buckwheat are always present in the villages and traditional homes in the country, depending on climate, water and soil of the region. Millets have more protein content than rice and wheat and is rich in vitamin A,B,iron, ,magnesium and manganese.

It is possible to create healthy new age fast foods by replacing flour with millets or other ancient grains. The focus on healthy eating and good nutrition cannot be understated, especially in the post-pandemic era. Eating whole grains such as wheat, rice, lentils and pulses is a common practice that has been recommended by experts. Millet is also one such ancient super food that has been garnering interest in the recent past. In India, millets are mostly cultivated in Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, Odisha, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttarakhand states.

Types of Millets:

Broadly there are six kinds of millets, each with its own benefits and ways to include them in the human diet. The health benefits and uses of different millets are unique and enumerated below.

1. **Pearl Millet (Bajra):** Bajra is a popular grain crop in North-West India, including Rajasthan and Haryana. This millets helps keep a check on cholesterol and is also recommended for diabetics. It is a rich source of iron, improves immunity. It is rich source of iron. It reduces cholesterol and stress levels, improves immunity, energy booster particularly for kids, promotes bone and heart health, beneficial in treating stomach ulcers, aids in weight loss and good for insomnia.
   Various delicious dishes like khichdi, roti, upma, parathas, idli are prepared out of this crop.

2. **Finger Millet (Ragi):** This crop is grown extensively in marginal soils of Eastern-Ghat high land zones of Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Uttarakhand *etc.* Finger millet is rich with multiple macronutrients and micronutrients, Vitamin B3, folate, calcium and iron. It also possesses antimicrobial properties.

   It reduces blood glucose level, promotes bone health, revive skin and hair health, repair injured muscle tissues, helps in reducing anxiety and insomnia.

   Various food preparations including roti, dosas, cookies, upma, porridge, cakes *etc.* are prepared using this crop.

3. **Barnyard Millet (Sanwa) :** Locally known as Sanwa, this millet is a gluten-free source of both insoluble and soluble fibers. Barn yard millet possesses antimutagenic, antioxidants and anti-inflammatory properties and is ideal for weight loss. To include it in the diet, we can make porridge, Khichdi and even Pulao.

4. **The Foxtail Millet (Kangni) :** The Foxtail millet, locally known as Kangni is a grain well-known for promoting good cardiac health and maintaining good hair and skin health and for thyroid control. It Improves immunity and digestion and for treating constipation.
   Dosas, chapattis, pancakes, brads and cookies *etc.* are some of the important delicacies worth to mention which are prepared using this crop.

5. **Kodo Millet :** Rich in fiber and iron, Kodo millet grain helps prevent constipation and control blood sugar. It strengthens nervous system and is beneficial for women suffering from postmenopausal disorders. It is used for making chapatis, idli, porridges, pulao and khichdi *etc.*

6. **Sorghum (Jowar) :** Some species of sorghum are grown for human consumption and some, in pastures for animals. It is great for human health, cuts bad cholesterol, protects from heart diseases, prevents cancer, improves digestive power, good for diabetic's control. It also helps in building healthy bones and red blood cells.

   Sorghum is used in preparation of snacks', baking items, brewing products and sometimes used as meat extenders for animals.

Conclusion

Millets are remarkable in their nutritive value be it vitamins, minerals, dietary fiber or other nutrients. It is nearly 3-5 times nutritionally superior to wheat and rice. Millets have low glycemic index compared to rice and wheat and is digested slowly there by lowering the sugar level in blood. The use of millets in commercial /packaged food will encourage farmers to grow millets as nutrient rich cereals and will open new opportunities to overcome the existing nutritional deficiencies .Millets being climate resilient crop can also benefit farmers financially under extreme climatic conditions and also offers long term sustainable production.

References

1.The Times of India, Healthy, Versatile and Budget Friendly: Ancient Grains are Back on Our Tables, 10th February ,2022 .

2. https://food.ndtv.com/food-drinks/7-kinds-of-millets-health-benefits-and-uses-shared-by-fssai-2449713

Barnyard Millet crop

Barnyard Millet grain

Kodo Millet crop

Kodo Millet grain

Foxtail Millet crop

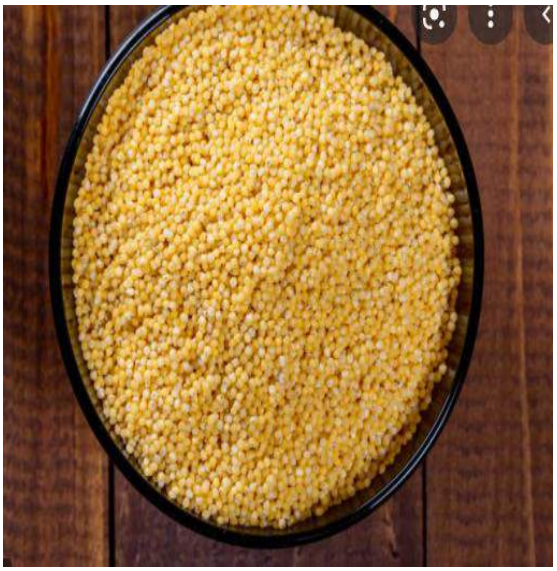

Foxtail Millet grain

Pearl Millet crop

Pearl Millet grain

Bajra Millet Crop

Bajra Millet grain

Sorghum Millet crop

Sorghum Millet grain

Blind Aping Of Western Culture By Young Indians

Dr. Subhas Chandra Saha

Indians often boast of inheriting one of the oldest civilizations in the world, being unique in terms of religious and spiritual thinking, art, literature, science, diverse socio-economic and cultural practices.Materialistic western culture has overtaken our youngsters and they ape it blindly. We also claim to be citizens of the largest democratic sovereign country. But sadly the west still dominates our way of thinking. The youths are most impressionable. They get easily impressed with anything and everything *e.g* fashions in dress, their music, dance and even their habits of food. By doing so, they think that they can impress others by being modern. Appearance of youths of today bears proof of this statement where we see that traditional Indian clothes do not appeal to their tastes. Today, we can hardly imagine wearing a dhoti-kurta to school. Today's fashion statements bear a western touch. Indian designers are blindly following their western counterparts. People today prefer pizzas, hamburgers rather than rice and dal.

Well, many times, dresses are only external manifestations. There have been substantial changes in the value system among Indian youths. Indian culture is one that has its own set of values like respecting elders, being cooperative, helpful and kind. These are the bonds that keep us together. But they 'used to', now they don't. They fail to keep the society together. The blends of western thoughts and development have resulted in the increase of ambitions of the people. They want more luxury; they now want to be mechanical.Sometimes they openly defy and make mockery of traditions, old ideas and ideologies. For example, an increasing number of old age homes and nuclear families bear testimony how the youngsters are trying to keep aloof from their responsibilities toward old parents.

Indian youths, especially the teenagers are much attracted to video games, computer games featuring violence and foreign films and music. This is the world of remakes and remixes. In most of the albums, one out of every five numbers are a remix. These are obviously inspired by western rock and jazz. A manifestation of influence of the west on Indian youths can be seen in the call centre culture which is the wastage of intelligence. This is truly detrimental. The Indians go for these, not caring for anything else but because they only get an exorbitant salaries.

The influence of the west can be seen even in our medium of teaching. The language which the youngsters communicate is English, a foreign language. Many do not even know their mother tongue but go on to learn French, German and what not.In India Sanskrit is one of the oldest languages, but how many Indians know this?

Our society is now adopting a capitalist trend and culture which is imbibing consumerism. This has resulted in the opening of shopping malls and multiplexes. Our culture is at stake. All of us know Mumbai is called "*Lancashire of India*", Himachal Pradesh is called "*Switzerland of*

India" *etc.* The only question that comes to my mind is, why not Lancashire called "Mumbai of England", why not Switzerland called "*Himachal Pradesh of Europe*". This answer is simple. Because we have adopted western culture in every walk of our life, starting from food to dress to education, probably in dreams also.

The growing pub culture in big cities has popularized boozing among young men. Late night discoes and beer-clubs are doing the rest. Actually the young generations in India are passing through a cultural crisis. Poverty, corruption, frequent communal rights, religious fanaticisms have created indifference towards their own culture. They are not exposed to the spiritual and lasting values of Indian culture. Lastly, we must admit it is the fault of our education and up bring. We should develop confidence and pride in our own culture. Can we take an oath to take the lead to make others follow us ?

" বিশ্বের সমস্ত শক্তি তোমার ভেতরে বিরাজমান, নিজেকে কখনোই দুর্বল ভেবো না। "

----- স্বামী বিবেকানন্দ

Ghee - The golden nectar of life

Dr.Satyabrata Maiti

There is an English proverb - Health is wealth. We were taught that if wealth is lost, nothing is lost; if health is lost, something is lost and if character is lost, everything is lost. We cannot enjoy our wealth, if we have a poor health. Considering that in mind, let's go back to our ancient wisdom of Ayurveda for our healthy life. I would like to discuss here a very common practice that we can follow to remain healthy irrespective of our age. Since time immemorial, Ghee has been an integral part of a "*sattvic bhojan*" (sound eating regimen) to annihilate side-effects of sicknesses in the body. It is the solid fat in ghee that works towards building a healthy liver and gut.

My appeal to modern mothers is to realize the importance of consuming Ghee daily by their children if they want their children to be intelligent, strong and healthy. They should remove from their mind that Ghee is unhealthy, it increases cholesterol level, etc as sometime endorsed by some uninformed or little informed doctors. I wish to place on record now before you about the goodness of Ghee for maintaining our healthy life.

Ghee is one of the most healing substances in Ayurveda and used as tonic. It is viewed as medicine in Ayurveda. In Ayurvedic literature, ghee is considered beneficial for the body. It helps to build the *sapta dhatus* in our body. That's not all — it is rich in antioxidants, fat soluble vitamins like vitamins A, E, and D. It also purifies the *vata*, *pitta*, and *kapha doshas* which get aggravated in our bodies.

Now, here's an important question — if there are so many significant uses of the consumption of ghee, which Ghee is favoured by Ayurveda? Answer is deshicow ghee.

More than just clarified butter, ghee made from cow's milk has a slightly nutty, golden flavour. It's full of medium and short chain fatty acids including butyrates, which support a strong digestion, bile flow and a healthy microbiome.

Description in scriptures

"Ghee promotes memory, intelligence, *agni*, *ojas*, *Kapha* and *medas*. It alleviates *Vata, Pitta*, poison, insanity, inauspiciousness and fever. It is the best of all fats and is cold, madhura rasa, madhuravipaka. It has 1000 potentialities and so, if used properly according to prescribed methods, exerts 1000 types of action. "

- ***Charaka Samhita***

Ayurvedic classic claims ghee is beneficial for the whole body, and recommends it as the ultimate remedy for problems stemming from the pitta dosha, such as inflammation.

-The Sushruta Samhita

Here are some benefits of cow ghee

- Cow ghee is known as *amritam* in Ayurveda, and is packed with A2 (absenceof β-casein proteins) content, which is very useful in treating cholesterol issues.
- Reduces acidity and improves digestion
- Enhances eyesight.
- Helps to reduce stress, anxiety, risk of cancer, diabetes, and improves immunity
- It is also anti-inflammatory in nature
- Helps to increase appetite and promotes flexibility.
- Consumption of cow ghee is beneficial during pregnancy, but only after consulting a doctor.
- Cow ghee improves the absorption of minerals and fatty acids in the body.
- In facial paralysis, cow's ghee is introduced in nostrils through nasya therapy in panchakarma. It increases *ojas* and *sattvic guna* in the body.
- Ghee for weight gain -For Shukradahatu (*Ashtanga Hrudayan* 16/5)

How is ghee made?

Traditional Method

Cow's milk is boiled and cooled. Then a spoonful of curd is added to this milk and kept at room temperature overnight. The curd is then churned to extract butter from it. This butter is then heated so that the water evaporates leaving behind pure ghee.

Modern Method

Cream is separated by centrifugation and the fresh cream is heated to give pure ghee. However, this preparation gives less flavour than the traditional Ghee preparation.

Chemical composition

Chemically, ghee is a complex lipid of glycerides (usually mixed), free fatty acids, phospholipids, sterols, sterol esters, fat soluble vitamins, carbonyls, hydrocarbons, carotenoids (only in ghee derived from cow milk), small amounts of charred casein and traces of calcium, phosphorus, iron, *etc.* It contains not more than 0.3% moisture. Glycerides constitute about 98% of the total material. Of the remaining constituents of about 2%, sterols (mostly cholesterol) occur to the extent of about 0.5%.

Ghee use in Hinduism and Buddhism

Traditionally, ghee is always made from bovine milk, as cows are considered sacred, and it is a sacred requirement in Vedicyajña and homa (fire rituals), through the medium of Agni (fire) to offer oblations to various deities. (See Yajurveda).

Fire rituals are utilized for ceremonies such as marriage and funerals. Ghee is required in Vedic worship of mūrtis (divine deities), with aarti (offering of ghee lamp) called diyā or dīpa and for Pañcāmṛta (Panchamruta) where ghee along with mishri, honey, milk, and dahi (curd) is used for bathing the deities on the appearance day of Krishna on Janmashtami, Śiva (Shiva) on Mahā-śivarātrī (Maha Shivaratri). There is a hymn to ghee. In the Mahabharata, the kaurava were born from pots of ghee.

Finding ghee pure enough to use for sacred purposes is a problem these days for devout Hindus, since many largescale producers add salt to their product. Ghee is also used in bhang in order to heat the cannabis to cause decarboxylation, making the drink psychoactive.

In Buddhist scripture, stages of dairy production are used as metaphors for stages of enlightenment. The highest-stage product, sarpir-maṇḍa, is theorised to be ghee or clarified butter (Wikipedia)

Usages

Ghee is one of the most healing substances in Ayurveda when used appropriately. It's full of medium and short chain fatty acids including butyrates, which support a strong digestion, bile flow and a healthy microbiome. Research suggests it can even shut off gene expression for cancer and inflammation. Contrary to popular belief, ghee does not raise cholesterol, and is high in CLA (conjugated linoleic acid), needed to build lean muscle mass and support weight loss. It is a good source of fat-soluble vitamins, including A, D, E, and K.

Ghee is taken with food for all who desire nourishment. It is best for those of Vata and Pitta constitution and especially those affected with fatigue, loss of strength, anaemia, jaundice and eye diseases. Young children, elderly and kapha individuals may enjoy ghee in moderation in small quantities. Add ghee to the daily diet of women, especially those who are pregnant. It is said to fortify the bones and the immune system.

It's high smoke point (485º F) makes it great for cooking. You'll find it used in everything from traditional Indian recipes to bulletproof coffee. Enjoy it on kitchari, sautéed vegetables or even popcorn.
In Panchakarma andAyurvedic cleansing, ghee is used because:

- It penetrates into and helps dissolve toxins in the tissues of the body. These wastes are then eliminated via the gut.
- Ghee increases agni // digestion, without aggravating pitta dosha.
- Ghee calms Pitta and Vata
- Ghee keeps all tissues of the body young and supple.
- Ghee can also be used in beauty and skin care.
- For dark circles: give your under-eye creams and serums a break and try ghee instead.
- For chapped and dark lips. Pour a drop of ghee on your fingertip and massage it gently over your lips.
- For dry skin: use ghee for *abhyanga* - apply it on your body before bath for soft and smooth skin.

How and what quantity to eat

People of*Vata* and *Pitta* constitutions (adult) may take 1-2 spoonful of Ghee daily. Children should be given ½ spoon to 1 spoon depending upon their physic. There are five different methods of Ghee consumption as per the diseases:

- For all the diseases below the naval cord such as piles, constipation, knee pain, swelling of legs, etc- drink 1-2 spoon full of Ghee just before the principal meals with hot water and then have your meal.
- For diseases around naval cord such as diseases of kidney (stone) liver disorder, Pancreas disorder, gall bladder stones, etc- drink 1-2 spoons full of Ghee in between the meal with hot water.
- For all circulatory diseases, blood related diseases; cardio-vascular diseases- drink 1-2 spoon full of Ghee just after the
meal with hot water.
- For Kapha related diseases such as bronchitis, asthma, dry cough- take 1-2 spoon full of Ghee along with the meal with hot water after the meal.

• For all diseases of Eye-Nose-Throat, mental disorder- drink 1-2 spoon full of Ghee before going to bed with hot water.
One can add Triphala and honey with Ghee and may drink with hot water.

Findings of Modern Science

• Modern science has confirmed at least a part of the ancient wisdom concerning the benefits of Ghee. One
interesting finding is that the saturated fat in ghee is primarily in the form of short chain fatty acids.
• Short chain fatty acids are easy to digest and help to promote the production of hormones and to strengthen
cellular membranes.
• On the contrary long chain fatty acids present in other fats and oils, are associated with a host of health
problems, including blood clotting, thrombosis, and cancer.
• Modern science tells us that ghee also harbors phenolic antioxidants, which bolster the immune system.
• One of the qualities of Ghee that makes it particularly useful in cooking is the fact that it has a very high
"smoke point." (385 degrees F). The "smoke point" is the temperature at which an oil starts to burn. It is at this
temperature also that the oil begins to oxidizeand creates the potential for cell damaging free radicals.

The last word

Ghee is nourishing and healing. Some consume it for weight reduction; others for weight gain and heart-related issues. So, accepting ghee as a part of your daily diet can be advantageous for your well-being and to fulfil well cherished desire of having healthy, physically and mentally strong future generation. Young or old, no matter, add ghee in your daily use.

Ghee has been considered immensely superior to other fats mainly because of the presence of characteristic short chain fatty acids, carrier of four fat soluble vitamins *viz.*, A, D, E, K and essential fatty acids such as linolenic acid and arachidonic acid.
The market penetration of ghee is about 37% in urban areas and about 21% in rural areas. Daily consumption of ghee in an adequate amount, imparts various health benefits such as binds toxins, enhances complexion and glow of the face and body, a great rejuvenator for the eyes, increases physical and mental stamina *etc.* in addition to providing sustaining energy.

Since, ghee is a fat-rich product; therefore natural antioxidants and other constituents like phospholipids and protein residues etc plays major role in preventing acidity.

References:

1. Benefits of Ghee: Why You Should Add It to Your Diet by Linda Knittel
2. *Essential Ayurveda* by Shubhra Krishan
3. *The Indian Materia Medica*
4. https://satyabratamaitiblog.wordpress.com/2021/02/15/ayurvedic-treatment-for-glaucoma-an-experience/
5. https://satyabratamaitiblog.wordpress.com/2022/01/25/my-30-day-walk-in-the-path-of-vipassana-as-monk/

ফুল ও ভালোবাসা

তনুরূপা কুন্ডু

ছোটবেলা থেকেই সাদা ফুল আমার বেশি প্রিয়। সেইজন্য ভালোবাসার তালিকায় দোলনচাঁপা, রজনীগন্ধা, বেলি, জুঁই, গন্ধরাজ, শিউলি এদের আধিক্য বেশি। অন্য ফুলেদের তুলনায় আমার এদের বেশি আপনজন মনে হয়। আমাদের পৈতৃক বাড়িতে এরা প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে বড়ো হয়েছিল। আমি এখনো চোখ বন্ধ করলেই যেন দেখতে পাই আমাদের বৈঠকখানা ঘরের পাশ দিয়ে সারিবদ্ধ বেলী ফুলের ঝোপ, ঝুল বারান্দার থামকে জড়িয়ে ধরে উঠে গেছে জুঁই গাছটা, আবার সেই শিউলি গাছটা যেটা পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মারতে মারতে কখন দোতলার বারান্দায় পৌঁছে গেছে। আমাদের গন্ধরাজ গাছটা আবার পাড়ার লোকজনের খবর রাখতে খুব ভালোবাসতো। তাই রাস্তার ধারে বাড়ির সামনের নিচু পাঁচিলের গা বেয়ে বেড়ে উঠেছিল সে। গাছটা পাড়ার সবাইকে দেখত বটে কিন্তু কারোর নাগালের মধ্যে আসতো না, কেবল নিজের সুবাস ছড়িয়ে দিত পাড়াময়। আমাদের দোলনচাঁপা গাছগুলো ছিল বাড়ির গোয়াল ঘরের পিছনের দিকটায়। মা বিকেলে চুল বেঁধে গা ধুয়ে খোঁপায় একটা গুঁজে দিত তাদেরই একজনকে। তাই রাতে মায়ের পাশে ঘুমালে দোলনচাঁপাও সঙ্গী হতো। এদের অবস্থান গুলো ছিল ঠিক বাড়ির মেজকাকা,ন'কাকা, ছোটকাকা, দাদু অথবা আমাদের ঘরের মতো নির্দিষ্ট জায়গায়। তাই বোধহয় এরা আজও পরম আত্মীয়ের মতো আমার মধ্যে বাস করে।

আমাদের পাড়াটাও ছিল এক বৃহৎ পরিবারের মতো। অবাধ আনাগোনা ছিল একে অপরের ঘরে। তাই সবার বাড়ির ফুল গাছগুলোও ছিল পরিচিত বন্ধুর মতো। কার্তিক দাদুর মস্ত বোগেনভেলিয়া গাছটার বিস্তার ছিল দাদুদের বাড়ির সামনের দিকটার অর্ধেকের বেশি জুড়ে। সেই গাছে ফুল ফুটলে সারা বাড়ি ম্যাজেন্টা রংয়ের হয়ে যেত। আমরা অবশ্য একে ছোটবেলায় কাগজ ফুল বলেই জানতাম। সেই গাছের নিচে দাদুর তৈরি পাথরের রবীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা গান্ধী, সুভাষচন্দ্রের বাস ছিল।পাশে আর এক দাদুর বাড়িতে লাল জবার গাছ ছিল। সেইসময় আমরা জানতাম জবা ফুল মানে শুধু লাল রঙেরই হয়।

একটু বড়ো হয়ে কারো কারো বাড়িতে গোলাপী রঙয়ের জবা দেখতে পেতাম। এখন তো হাইব্রিডের কল্যানে জবার অনেক রঙ দেখতে পাওয়া যায়। ছোটবেলায় সেই দাদুর বাড়িতে রোজ সকালে জবা ফুল আনতে যেতাম ঠাকুমার পুজোর জন্য।কত যে অজস্র জবা ফুটে থাকত গাছে। গাছটা অদ্ভুত লতানো বীথির মতো। প্রতিদিন দুশো তিনশো ফুল ফুটতো। যদিও আজ মনে পড়ে না ওটা একটা গাছ ছিল না একের অধিক গাছ জড়িয়ে বীথি বানিয়ে নিয়ে ছিল। জবা গাছে লাগানো থাকত একটা আঁকশি ফুল পাড়ার জন্য। পাড়ার সবাই আসতো ফুল নিতে। আর সেই বাহানায় দাদু ঠাকুমা সবার সঙ্গে খানিক গল্প সেরে নিতো। আমার কাছে খোঁজ নিতেন আসাম থেকে গরমের ছুটিতে ছেলেমেয়ে নিয়ে ঊষা (আমার মেজপিসি) কবে বেড়াতে আসছে। এলে যেন পিসিরা সপরিবারে অবশ্যই তাঁদের বাড়ি দেখা করে যায়। আমার মা যে সোয়েটার শুরু করেছিল দাদার জন্য সেটা শেষ হয়েছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। কি সরল জীবনযাপন ছিল সেইসময়।

এবার আসি বকুল ফুলের কথায়। আমাদের পাড়ায় বহু পুরোনো এক শিবমন্দির আছে। একসময়ে শ্যামাচরণ লাহিড়ীদের গৃহদেবতা ছিলেন শিব ঠাকুর। তাদের ঘরেই পূজিত হতো এই শিবলিঙ্গ। পরবর্তীতে এই শিবলিঙ্গ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখন এই মন্দির ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত। মন্দিরের জন্যই আমাদের পাড়ার নাম ঘূর্ণি, শিবতলা। এই মন্দিরে ঢোকার মুখে ছিল বহু পুরোনো একটা বড়ো বকুল গাছ। এতো বড়ো বকুল গাছ আমি আর কখনো দেখিনি। এই গাছের তলায় অনেক বকুল ফুল পড়ে থাকত। আমি আর আমার কয়েকজন সমবয়সী বিকালে খেলার ফাঁকে বকুল ফুল কুড়োতে যেতাম। হাত ভরে অথবা জামার কোঁচ ভরে ফুল নিয়ে বাড়ি ফিরতাম। মা একটা কাঁচের পাত্রে জল দিয়ে ফুলগুলো শোবার ঘরে রেখে দিত। রাতভর আমাদের ঘর বকুল ফুলের গন্ধে ম ম করত।

পাশের পাড়াতে থাকত আমার দাদুর ন'ভাইয়ের পরিবার। সেখানে আমার অবাধ যাতায়াত ছিল। ন'দাদুর মেয়েরা সম্পর্কে আমার পিসি ও ছেলেরা আমার কাকা হন। আমার নিজের তিন পিসির পরিবারকে পিসেমশাইদের চাকরির সূত্রে বাংলার বাইরে থাকতে হতো। তাই বছরে একবার তাদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হতো। কিন্তু এই খুড়তুতো পিসিরা ছিল আমার আর দাদার আবদারের জায়গা। যখন পিসিরা আবার নিজেদের বাড়ি ফিরে যেতেন(যা কিনা পাশের পাড়াতেই) আমরা ভাইবোন কেঁদে ভাসাতাম। কবে আবার এসে থাকবে আমাদের সঙ্গে তার প্রতিশ্রুতি দেবার পরই পিসিদের নিস্তার হতো। সেই বয়সে দুই পিসির প্রতি ভালোবাসা ছিল প্রাণাধিক। শিব মন্দির সংলগ্ন বকুল গাছটা ছিল আমাদের দুই পাড়ার মাঝখানে। সারা বিকেল ধরে চলত বকুল ফুল কুড়োনো। তারপর এর মালা গাঁথা। বকুল ফুল কুড়োতে কুড়োতে সন্ধ্যে নেমে আসতো। এরপর বাড়ি গিয়ে সুতো দিয়ে মালা গাঁথলে মা আর বাড়ির বাইরে যেতে দেবে না। তাহলে মালা গেঁথে পিসিকে আর পরানো হবে না এই ভয়ে আর বাড়ি যেতাম না। বকুল গাছের পাশেই একটা বাড়িতে স্বর্ণলতার ঝুড়ি ঝুলত হলুদ রঙের। সেগুলো টেনে টুনে কোনো রকমে পেড়েই ছুট দিতাম পিসিদের বাড়ি। সেখানে চলত মালা গাঁথা। পিসিও সেই সময়ে ঘরের কাজ সেরে গা ধুয়ে উঠে আসত । পিসির বেণী সাজিয়ে দিতাম বকুল ফুলের মালায় । পিসিও খুশি হয়ে আদরে ভরিয়ে দিত।

' নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল। '

-- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Wadi Rum In Jordan - The Mars On The Earth

Dr. K K Satapathy

Jordan was one of the top ten countries to visit in 2019 picked by 'Lonely Planet' travel agency. I got the opportunity to visit the country as a part of the package tour organized by an agency in Kolkata. I have been hearing about the great Wadi Rum desert nick named '*the valley of the moon'* located in the southern part of Jordan. It is known for its red pink sands, strange shaped rock formations with prehistoric rock engravings, natural arches and canyons cutting their way through these mountains. It is about 70 km north-east of Aquaba (the southern border crossing from Israel), 100km from the ancient city Petra and 300 km from Amman, the capital city. T. E. Lawrence (Lawrence of Arabia fame) spent a significant period of time here during the course of the British inspired Arab revolt against Ottoman Empire during the First World War (1914-18).

Landing at the Amman airport from Kolkata via Doha, we proceded for the town, Madaba. Halting at landmarks like Mount Nebo, and Madaba, we reached the ancient Petra city. Spending one day there, we finally arrived at Aquaba located at 70 kilometer away from Wadi Rum, for night halt in a city hotel there. Next morning we visited the Aquaba fort nearby which is in ruins. The fort is where British general, Lawrence (Lawrence of Arabia fame) occupied and started to capture Arab countries. Just after the Aquaba city the territory of Israel started. Wadi Rum is a short detour from the desert highway between Amman and Aquaba. After checking out from the hotel we travelled by a bus for about one hour to reach the great desert. A side road leads to the entrance where we found the Wadi Rum visitor center, a police station and a lot of potential guides offering camel and 4x4 trucks. For travelers planning a day trip like us from Aquaba, a guided jeep tour of the area is the best option to see it all. Bedouin cooperatives have vehicles and guides available for hire each day. This area of Jordan is quite isolated and largely inhospitable. We got down from the bus and entered a 4 x 4 wheel drive open zeep which took us deep inside the desert.

Wadi Rum desert

Sandstone Mountains create a supernatural Mars like landscape and environment, making one feel like stepping foot on another planet. The spectacle with an expanse of orange and pink. Wadi Rum is a protected desert comprising of an area of 720 square kilometer. It is a magical place and beauty is astounding. The exquisite reddish orange coloured sand and ethereal sand between towering rocks, weathered cliffs is the main tourist attraction. More than just a sea of rolling dunes, the protected desert is made unique by sand stone and Basalt Mountains jutting out of its sandy floor. It looked like Halong Bay of Vietnam or Phuket of Thailand where rocks have emerged from sea but here these jutted out of sand. The landscape of Sandstone Mountains was curved out as a result of million years of evolution influenced by diverse factors, including various types of weathering and erosion associated with previous humid climates and later desert climate, tectonic activities and lithology *etc.* creating Wadis (valleys) and the cliffs. The diversity and very large scale land forms, the panoramic view of both extensive Wadis and narrow canyons and its reddish orange hues add to its aesthetics. Erosion constantly cut into the soft sandstone of the region until it eventually curved out of the unusual rock formation. The climate somewhat cold with bright sunshine, but in summer, it goes up to 50^0 C.

Wadi Rum rock formations and camel riding

There is an orange hued sand dune area which is a prime area for speed racing down the slope. Not just sweeping sand dunes and enormous rock mountains, a spectacular series of natural arches jutting out rocks (far apart from one another) towering cliffs, massive landslides, dramatic cavernous weathering forms and narrow gorges can also be viewed here. One of the most popular destinations of the region and one of the famous land-mark of Wadi Rum is the imposing rock bridge situated at a place called Jibel Burdah. The rock bridges are work of art. Burdah is the highest of three natural arches created by wind and water erosion whittling away the softer surrounding rock. The narrow fissures of Khazali canyon slices through a massive crag formation. Inside the canyon, the high walls provide shade from the sun and are deliciously cool. The

initial 200 meters can be easily explored on a short walk, and the rock faces inside are home to several thematic rock inscriptions that show that Khazali canyon has been used

as a place of shelter since ancient times. The canyon gets full of water when it rains and is very difficult to walk through it. Wadi Rum is the Arabic term traditionally referring to the river bed or valley that is normally dry except rainy season. In spite of adverse dry climate, there is still some vegetation in the desert valley, a few bushes have managed to adapt to the unique environment.

Walking through rock canyons

Here one has many chances to take genuine desert adventures. There are several high peaks, the highest being 6,000 ft. Wadi Rum is Jordan's top rock climbing area, and a couple of qualified local guides operating out of the Ram village offer rock climbing tours of several climbing routes across the cliffs and crags of the area. An overnight Wadi Rum stay – in overnight camp that range from rustic to luxurious – means one get to see the desert at sunset and sunrise, when the colour of the cliffs and crags and sand below, said to be mellow and shimmer in the changing light.

Beyond the inherent beauty of Wadi Rum, its history and a rich cultural heritage add to allure as a destination. Human habitation here can be dated back to prehistoric times. But Wadi Rum's importance began when Thamudic tribes from Arabian Peninsula began using this area as part of their trade routes. The Nabateans had taken control of the desert by 2nd Century BC. They left their mark in the form of temples, petroglyphs, inscriptions and rock drawings which can be found throughout the desert. There are apparently 25,000 petroglyphs (rock carvings), 20,000 inscriptions, and 154 archeological sites have been discovered within this place. The petroglyphs, mostly engraved in rocks, boulder cliff faces span all eras from Neolithic to Nabataean portraying camel caravans, hunting parties, desert animals, female figures as well as various pastoral, agricultural and human activities here. The inscriptions are mainly in four different scripts: Thamudic, Nabataean, Islamic and Arabic. Khazali Canyon is famous for Nabataean etchings featuring humans and animals.

Currently its inhabitants of the area are mainly Bedouins. The Bedouin, Wadi Rum's local people, have been living here for thousands of years. Ancient Bedouin tribes were nomads herding their goats and sheep around the desert, roaming this land of dry sands

and setting up temporary settlements as they went. The word Bedouin comes from the Arabic Badawi, meaning “desert dweller” However most of them now live in their goat hair tents and concrete houses in the adjacent Rum village. The local Bedouin communities of Wadi Rum are closely involved with both managing the park and providing tourism activities to the visitors. We were offered herbal tea inside a small Bedouin shop selling souvenirs and other products. Bedouin tea is basically black tea with cardamom, lot of sugars and sometimes cinnamon. Today visitors can learn about their history and culture by staying at a Bedouin campsite while visiting Jordan.

Enjoying Beduin hospitality

Recently, Wadi Rum was introduced to the western world by T E Lawrence famously known as “Lawrence of Arabia”, a British officer turned author who was periodically based in the area during the Arab revolt of 1917. In 1916 the world was at war and much of the Arabic speaking world was controlled by Ottoman Turkish Empire. The allied forces of Britain, France and Russia, drove away the Turks out of the region. The Arabs assisted in a major war effort to defeat Turks under the leadership of Prince Faisal and with the assistance of illustrious T E Lawrence of Arabia set up camps here. The Arabs fought guerilla war by interrupting train passages on Hijaz railway. Earlier people used to go to Macca in Saudi Arabia on camel back or horse cart. The rail line was constructed in 1908 for export of men and material to Aquaba port. But after the Arab revolt against Turkish Empire, it was over. The narrow gauge railway line still extant but

abandoned. The remnants of Lawrence's house on a ridge above desert plateau still exist. Lawrence's book, the seven Pillars of Wisdom brought Wadi Rum to the attention of the world. There is also a natural spring area which is a regular stop on Wadi Rum itineraries. The spring itself said to be the resting place mentioned in T E Lawrence's seven pillars of wisdom where Lawrence of Arabia is thought to have washed during the Arab revolt.

With this rugged landscape's raw beauty with reddish sand and mountains looking like red surface in Mars, Wadi Rum is a Hollywood favorite for films set on the red planet. The movie, it is most famous for is 'Lawrence of Arabia', which first flaunted Wadi Rum's magnificent desert panoramas of orange and pink sand desert and granite mountains loomed over by vast rock outcrops to a global cinema audience. Many other films also have been filmed in Wadi Rum like: Rogue One, A Star Wars Story, Prometheus, Red Planet, The Last Days on Mars, Transformers: Revenge of the Fallen, Passion in the Desert and the Martian *etc.* The movie Martian is based on a story of some astronaut who gets stranded on mars well turned out it was actually filmed here.

Wadi Rum night camps

We had lunch inside the desert in large-size dome. Lot of Indian tourists apparently come here as evidenced by playing Hindi film songs there. After lunch, we started for return journey to Amman, the capital city of Jordan. However the spectacular scenery of Wadi Rum remained afresh, being a life-time experience.

আট্টুকাল পোঙগল

ডঃ উৎপলা পার্থসারথি

চাকরী সূত্রে গত দুই দশক কেরলাতে আছি আর সময় পেলেই বেড়াতে যাই। গত ২০১৯ এর ফেব্রুয়ারী মাসে আমার চার বন্ধু কলকাতা থেকে আমার কাছে বেড়াতে আসে। সবাই মিলে ঠিক করলাম কেরলার রাজধানী ত্রিবান্দ্রমে বেড়াতে যাব।

কেরলার আর একটা নাম হলো 'গড'স ওন কান্ট্রি' তার কারণ সমুদ্র ,পাহাড় আর ব্যাক ওয়াটার ছাড়া এখানে যা দেখার আছে তা হলো ছোট বড় নানা মন্দির যেখানে অধিষ্ঠিত দেবতারা বিষ্ণু, শিব এবং পার্বতী নানা রূপে তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজমান।

আমরা ৯ই মার্চ,২০১৯ সকালে ত্রিবান্দ্রমে পৌঁছলাম। হোটেল আগেই ঠিক করা ছিল, একটু পরিষ্কার হয়ে সোজা হোটেলের ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস -এ চলে গেলাম কোথায় বেরুনো যায় তার অনুসন্ধানে।

ম্যানেজার বললেন আপনারা যখন আজ এসেছেন তখন আমি বলব আপনারা প্রথমে আট্টুকাল টেম্পলে প্রথম যান ওটা শহরের মধ্যেই এবং বিখ্যাত অনন্তশয়নম পদ্মনাভন মন্দির থেকে মাত্র ২ কিমি। আজ ওখানে বিশেষ অনুষ্ঠান আট্টুকাল পোঙগল আছে। ওরা জানালেন যে এই দিন ওখানে এত মহিলা সমাগম হয় যে ওই মন্দিরের নাম 'গিনেস বুক অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড ' এ আছে। ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ এ ১.৫ মিলিয়ন মহিলা এখানে এসেছিলেন ওই সময় প্রথম 'গিনেস বুক অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড' এ এই মন্দিরের নাম নথিভুক্ত হয় । পরে অবশ্য মন্দিরের ট্রাস্টির কাছ থেকে আমরা জেনেছিলাম ২০১৩ তে ২.৫ মিলিয়ন মহিলা এখানে এসেছিলেন। এত সব বিবরণ শুনে আমরা রাজি হয়ে গেলাম আর আধ ঘন্টার মধ্যে আট্টুকাল মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। গিয়ে দেখি জনসমুদ্র। মন্দিরের বাইরে গাছের নিচে গৃহবধূরা দলে দলে নতুন রঙ বেরঙের শাড়ি পরে একটা করে মাটির হাঁড়ি নিয়ে বসেছে। কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে মাটির হাঁড়িতে চাল ডাল দিয়ে পোঙ্গল রান্না করছে তারপর দেবী আট্টুকালকে নিবেদন করে নিজেরা প্রসাদ নিচ্ছে।

সে এক এলাহী কারবার। এই পোঙ্গলকে আট্টুকাল পোঙগল বলে। খেতে অনেকটা আমাদের খিচুড়ির মত তবে অনেক কাজুবাদাম আর কিসমিস দেওয়া থাকে। আর থাকে খুব সুন্দর ঘি এর গন্ধ। এই পোঙ্গল বানাবার একটা বিশেষ সময় থাকে।ভক্তরা বিশ্বাস করে ওই সময়ের মধ্যে দেবীকে পোঙ্গল খাওয়ালে মনের সব ইচ্ছে পূর্ণ হয়। এখানে দেবী ভগবতী তবে আট্টুকাল পোঙ্গলে দেবীকে লক্ষী ,সরস্বতী ও ভগবতী এই তিন রূপেই পুজো করা হয়। বোধহয় নারী শক্তির একটা পরিপূর্ণ রূপ কল্পনা করে।

আট্টুকাল মন্দিরের দেবী আসলে ভদ্রকালী (ওদের ভাষায় দেবীর নাম 'কান্নাগী ')। দেবী পানপাতার উপর উপবিষ্টা। এই দেবী মহাকালী রূপে দানব রাজা দ্বারুকাকে মেরে ছিলেন। বিশ্বাস করা হয় দেবী শিবের ত্রিনয়ন থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন। তবে এই আট্টুকাল পোঙ্গলের গল্পটা হলো - দেবী পশ্চিমঘাট পর্বতের কোলে এক ধনী ব্যবসায়ীর কন্যা হয়ে জন্মেছিলেন এবং

তার নাম ছিল কান্নাগি)। বয়সকালে তার অন্য একজন ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র কোভালান-এর সাথে বিয়ে হয়। কিন্তু কোভালানের চরিত্র ভালো ছিল না। মাধুরী নামে এক বাইজির জন্য তিনি তার সমস্ত ধন -সম্পত্তি নষ্ট করেন। কান্নাগি সব জেনেও তার স্বামীকে ক্ষমা করেন এবং ওঁকে নিয়েই শান্তিতে সংসার করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একদিন তিনি কান্নাগির একটা পায়ের নুপুর বিক্রি করে মাধুরীকে পয়সা দিতে চান ও রাজার লোকের হাতে ধরা পড়েন। তখন সব জানতে পেরে রাজা তার শিরোচ্ছেদন করেন। এতে কান্নাগি খুব রেগে যান এবং দেবী রূপ ধারণ করে রাজার রাজ্য (মাদুরাই) তার চোখের আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। সেই থেকে দেবী কান্নাগি সতী নারীদের পূজ্য হন।গৃহবধূরা তাদের গৃহের সব রকম শান্তির জন্য এবং সংসারকে নিজেদের স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে নিজেদের অধিকারে রাখার জন্য ওই বিশেষ দিনে দেবীর পুজো করেন এবং দেবীকে পোঙগল উৎসর্গ করেন।

এখানে আমরা একটি বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করে খুব আনন্দিত হয়েছিলাম যে এটা একটা হিন্দু মন্দির কিন্তু অনেক খ্রিষ্টান মহিলারাও ওই দিন মন্দিরের বাইরে উপস্থিত থেকে পোঙগল রান্না করেন এবং দেবীকে উৎসর্গ করেন।

সারাদিন ধরে আমরা মন্দির প্রাঙ্গনে বসে অনেক ভক্তদের আপ্যায়ন গ্রহণ করে প্রসন্ন চিত্তে হোটেলে ফিরে আসি।

আট্টুকাল মন্দির

বেড়িয়ে এলাম নিউইয়র্কের স্ট্যাচু অফ লিবার্টি এবং এলিস দ্বীপ

তনুরুপা কুন্ডু ও দিলীপ কুন্ডু

গত নভেম্বরে আমরা কয়েক মাসের জন্য আমেরিকার ডালাসে মেয়ের কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ডিসেম্বরের ভ্যাকেশনে মেয়ে সেখান থেকে আমাদের সপ্তাহখানেকের জন্য ওয়াসিংটন ডিসি এবং নিউইয়র্ক ভ্রমণে নিয়ে গিয়েছিল। ডালাস থেকে সকালের ফ্লাইটে ওয়াসিংটন ডিসি পৌঁছে প্রথম দিন বিকেলে এবং পরদিন সকালে ওয়াসিংটন শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে ট্রেনে চেপে আমরা নিউইয়র্ক গিয়েছিলাম।

আমরা দুপুর দুটো নাগাদ ওয়াসিংটন ডিসি Union station এ পৌঁছে হালকা কিছু খেয়ে নিয়ে ট্রেনে উঠলাম। Amtrak train এ বসার ব্যবস্থা কিছুটা আমাদের শতাব্দী ট্রেনের মতো। তবে কোনো সিট্ নাম্বার থাকে না বলে নিজের পছন্দ মতো জায়গা নিয়ে বসা যায়। আমাদের গন্তব্য স্টেশনের নাম নিউইয়র্ক Pennsyllvania station, ছোট করে Penn station . এবার যাত্রা শুরু হলো।Baltimore and Potomac tunnel এর ভিতর দিয়ে, ফিলাডেলফিয়া শহরের ওপর দিয়ে আমাদের ট্রেন ছুটে চললো। দুধারে শান্ত গ্রাম, অরণ্য, অনেক ব্রীজ চোখে পড়ল। দেখলাম বিখ্যাত Lower Tenton Bridge .প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা লাগল নিউইয়র্কের Penn Station এ পৌঁছাতে। তখন বিকেল পৌনে ছটা বেজে গেছে। স্টেশন চত্বর বেশ বড়ো আর জমজমাট। অনেক খাবারের দোকান। নিউইয়র্কের পিৎজা তুলনামূলকভাবে বেশ সস্তা আর খুব সুস্বাদু। তাই রাতের ডিনারের জন্য একটা এক্সট্রালার্জ সাইজের পিৎজা কিনে আমরা স্টেশন চত্বর ছাড়লাম। তখন টিপ টিপ করে হালকা বৃষ্টিও শুরু হয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। একটা Uber Taxi নিয়ে আমরা রওনা হলাম হোটেল Hilton Garden Inn, Lower Manhattan এর উদ্দেশ্যে। আধ ঘন্টা লাগল আমাদের হোটেলে পৌঁছাতে।

Hilton Garden Inn হোটেলটি হাডসন নদীর তীরে অবস্থিত। হোটেলের ঠিক উল্টো দিকেই আছে Staten Island Ferry Terminal আর Battery Park. এই ফেরিঘাট থেকে New Jersey যাতায়াত করার জাহাজ সেবা(cruise service) রয়েছে। প্রতিদিন প্রচুর লোক নিউ জার্সি থেকে নিউইয়র্ক আসে কাজ করতে। নিউইয়র্কের সাবওয়ে(underground rail, শহরের lifeline) আমাদের হোটেল থেকে মাত্র দুশো মিটারের মধ্যে। সাবওয়ে থেকে ট্রেন ধরে নিউইয়র্ক শহরের যেকোনো শহরের যেকোনো স্থানে কিছু সময়ের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায়।এখান থেকে ট্রেনে করে টাইম স্কয়ার, সেন্ট্রাল পার্ক, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং 9/11 মেমোরিয়াল পৌঁছতে মাত্র কয়েক মিনিট লাগে। Empire State Building পৌঁছতে বিশ মিনিট মতো সময় লাগে। হোটেল থেকে পায়ে হেঁটে Wall Street, Charging Bull মাত্র পাঁচ মিনিটের রাস্তা। আবার ফেরিতে Ellis Island, Statue of Liberty পৌঁছতেও মাত্র দশ মিনিট লাগে। সেইজন্য location অনুযায়ী নিউইয়র্ক শহর ঘুরে দেখার জন্য এই হোটেলটি খুব ভালো। তাছাড়া হোটেলে আমাদের বুক করা রুমটি ২৫তলায় এবং river facing ছিল বলে রুমে বসেই

হাডসন নদীর অতুলনীয় দৃশ্য উপভোগ করা যেত। লম্বা ট্রেন সফর করা আসায় বেশ ক্লান্ত লাগছিল। সঙ্গে আনা সেই পিৎজা উদরস্থ করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেল। হোটেলের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে তো আমি অভিভূত। অনতিদূরেই হাডসন নদীতে ছোট বড় বিভিন্ন সাইজের জাহাজের আনাগোনা ও দূরের দ্বীপ থেকে ম্যানহাটনে ferry cruiseএর যাতায়াত চলছে। মাঝে মাঝে আকাশ পথে হেলিকপ্টারও চক্কর কাটছে। একটা হেলিপ্যাড আছে হোটেলের কাছেই নদীর তীরে। আজ Statue of Liberty দেখতে যাব বলে একটা উত্তেজনা ঘিরে ছিল। ঠিক যেমনটা বিবেকানন্দ রক এবং তাজমহল প্রথম দেখার সময় অনুভব করেছিলাম। ছোট বেলায় বইয়ের পাতার ছবি থেকে অবাক হওয়ার স্মৃতি গুলো মনের মধ্যে ভিড় করতে শুরু করল। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে হোটেল রুমেই ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম।

হোটেলের উল্টোদিকেই ব্যাটারি পার্ক, এখান থেকে আমাদের Cruise ছাড়বে সকাল সাড়ে আটটায় লিবার্টি আইল্যান্ড এর উদ্দেশ্যে। আইল্যান্ড এ প্রবেশ সহ cruiseএর টিকিট আমাদের আগে থেকেই কাটা ছিল। হোটেল থেকে টিকিটের প্রিন্ট আউট নিয়ে আমরা রওনা দিলাম। ডিসেম্বর মাসের শীতে জমে যাওয়ার মতো ঠান্ডা হাওয়াও দিচ্ছিল। শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমরা cruise এ উঠে পড়লাম। ধবধবে সাদা cruise জনা ৩০০ যাত্রী নিয়ে রওনা হলো। সমুদ্রের ভিতরের দিকে যত যাচ্ছিলাম , দেখতে পাচ্ছিলাম বড় বড় মালবাহী জাহাজ নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষনের মধ্যেই আমাদের চোখে ধরা দিল সেই ঐতিহাসিক স্ট্যাচু। আমরা অল্পসময়ের মধ্যেই লিবার্টি আইল্যান্ড এ এসে পৌঁছলাম।

cruise থেকে নেমে আমরা সংগ্রহ করলাম audio tour guide . ফোনের মতো এই যন্ত্রটি হিন্দিসহ অন্যান্য বারোটি ভাষায় গাইড করে। এই যন্ত্রটির সাহায্য নিয়ে আমরা ঐতিহাসিক দ্বীপটির সঙ্গে পরিচিত হতে হতে এগিয়ে চললাম। সবুজ ঘাসে মোড়া দ্বীপটি ১৪.৭ একর জায়গা নিয়ে। চারিদিকে অনেক সিগাল এর আনাগোনা। এরা পর্যটকদের সঙ্গে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এই দ্বীপে স্ট্যাচু ছাড়াও বেশ বড়ো একটা মিউজিয়াম আছে।

স্ট্যাচু অফ লিবার্টি

ফ্রান্স ও আমেরিকা এই দুই দেশের বন্ধুত্বের স্মারক। আমেরিকার স্বাধীনতা প্রাপ্তির শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ফ্রান্স এই স্ট্যাচুটি উপহার দেয়। নিউইয়র্ক উপসাগরের লিবার্টি দ্বীপে এটি স্থাপন করা হয়। মূর্তিটির মোট উচ্চতা বেসমেন্ট থেকে মুকুট পর্যন্ত ৩০৫ ফুট। মূর্তিটির পা থেকে মুকুট পর্যন্ত উচ্চতা ১১১ ফুট ৬ ইঞ্চি। এটি তৈরি করেন ফ্রান্সের ভাস্কর Federic Auguste Bartholdi, দুটি কয়েনের মতো পুরু তামার পরত দিয়ে। মূর্তিটির ওজন ২২৫ টন। Alexandre Gustave Eiffel(যিনি Eiffel Tower বানিয়েছিলেন) তৈরি করেন মূর্তিটির ভিতরের লোহার কাঠামো। মূর্তিটির পাদবেদি বানানোর জন্য ধনরাশি এসেছিল আমেরিকা বাসীদের থেকে চাঁদা তুলে সংগ্রহ করা পুঁজি থেকে। শোনা যায় কেউ কেউ এক ডলার দিয়েও পুঁজি সংগ্রহে সাহায্য করেছিল। এইভাবে দুই দেশের যৌথ উদ্যেগে এই মনুমেন্ট তৈরি করা হয়।

আমেরিকার স্বাধীনতার প্রথম শতবর্ষে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লেভল্যামড জাতির উদ্দ্যেশ্যে ১৮৮৬ সালের ২৮শে অক্টোবর এই মনুমেন্টটি উৎসর্গ করেন। বার্থোল্ডি মূর্তিটির নামকরণ করেন স্ট্যাচু অফ লিবার্টি এনলাইটিং দ্য ওয়ার্ল্ড ।মূর্তিটি ঢিলে পোশাকে দাঁড়ানো এক মহিলা , যার ডান হাতে জ্বলন্ত মশাল উঁচু করে ধরা, আর বাঁ হাতে ধরা একটি

ফলক যাতে রোমান অক্ষরে খোদাই করা আছে : July IV MDCCLXXVI(অর্থাৎ 4th July 1776). এই দিনে আমেরিকা স্বাধীন হয়ে ছিল। মূর্তিটির পায়ের কাছে পড়ে আছে একটি ভাঙা শিকল। ডান হাতে ধরা তামার তৈরি মশাল টি ১৯৮৬ সালে সরিয়ে সেখানে 24k gold এর পরত দেওয়া মশাল বসানো হয়। বর্তমানে তামার পরতে তৈরী আসল মশাল টি দ্বীপের মিউজিয়ামে রাখা আছে। এই মশাল টি পরাধীনতা ও অজ্ঞানতা থেকে মুক্তির প্রতীক। মাথার মুকুটে সাত টি শিখা আছে যা সাত সমুদ্র ও সাত মহাদেশের প্রতীক। তামার তৈরি এই মূর্তিটি বহু বছর ধরে খোলা হাওয়ায় থাকার জন্য রাসায়নিক পরিবর্তনে রঙ বদলে হালকা সবুজ রঙের হয়ে গেছে। স্ট্যাচুর বেসমেন্ট থেকে মুকুট পর্যন্ত ওঠার জন্য ভিতর দিয়ে মোট ৩৫৪ টি সিঁড়ি আছে। বেসমেন্ট থেকে মূর্তিটির পাদবেদি পর্যন্ত ২০০টি সিঁড়ি সর্পিলভাবে উঠে গেছে, তারপর পাদবেদি থেকে মুকুট পর্যন্ত পৌঁছনোর জন্য বাকি ১৫৪টি সিঁড়ি, এগুলি অনেক সরু ও লোহার তৈরি। আমরা অতো ভাগ্যবান ছিলাম না,পাদবেদি পর্যন্তই উঠতে পেরেছিলাম। পাদবেদিটি চারিদিকে ব্যালকনি দিয়ে ঘেরা। সেখান থেকে আমরা Upper New York Bay, দূরে নিউইয়র্ক শহর,এলিস আইল্যান্ড এর সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করেছিলাম। এরপর আমরা লিবার্টি মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। এই মিউজিয়াম এর প্রধান আকর্ষণ ছিল স্ট্যাচুর আসল / আদি মশাল, সেটি এখানে রাখা আছে। তাছাড়া এই মিউজিয়ামের স্ট্যাচু অফ লিবার্টি সম্বন্ধীয় সব তথ্য নথিভুক্ত করা আছে।

এলিস দ্বীপ

এবার আমরা আবার cruise এ করে মাত্র দশ মিনিট দূরে এলিস আইল্যান্ড এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।দ্বীপটি ২৭.৫ একর জায়গা নিয়ে। এর সর্বশেষ ব্যক্তিগত মালিক স্যামুয়েল এলিস এর নামে দ্বীপটির নামকরণ করা হয়। ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত দ্বীপটি ব্যবহার করা হতো জলদস্যু, কুখ্যাত অপরাধী এবং বিদ্রোহী নাবিকদের ফাঁসি দেওয়ার জায়গা হিসেবে। পরবর্তী কালে এই দ্বীপটিকে ১৮৯২ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত আমেরিকার Immigration Station বানানো হয়। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে (বিশেষত দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপ থেকে) প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ নিজেদের দেশ ছেড়ে আমেরিকাতে বসবাস করার জন্য এসেছিল। এই স্টেশনে এদের সবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা, কর্মদক্ষতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি পরীক্ষা করা হতো। সব পরীক্ষায় উত্তীর্ন হলে তবেই আমেরিকার নাগরিকত্ব প্রদান করে এদের প্রবেশ করতে দেওয়া হতো। এই পদ্ধতি ছিল বেশ কঠিন। বর্তমান আমেরিকার মোট নাগরিকের প্রায় ৪০ শতাংশের পূর্বসূরিরা এই Ellis Island Immigration Station দিয়ে আমেরিকায় প্রবেশ করেছিল। সেই সময়ের Immigration register, স্বাস্থ্য পরীক্ষার পদ্ধতি, সেই সময়ে আগত লোকজনের ব্যবহৃত লাগেজ ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিস একটা বড়ো মিউজিয়ামের মধ্যে সংরক্ষন করে এই দ্বীপে রাখা আছে। আমরা এখানে ঘন্টাখানেক কাটিয়ে আবার cruise এ করে Manhattan এ ফিরে এলাম।

তখন দুপুর দেড়টা বেজে গিয়েছে। প্রচন্ড খিদে পেয়েছে। তাই সামনেই একটা মেক্সিকান রেস্টুরেন্ট এ ঢুকে পড়লাম দুপুরের খাবার জন্য। বেশ ভিড়। রেস্টুরেন্টের নাম 'Dos Toros Taqueria', বিভিন্ন ধরণের মেক্সিকান ডিস্ পাওয়া যায় এখানে। আমরা নিরামিষ rice based ডিস্ বোল এর অর্ডার দিলাম। মেক্সিকান ডিস গুলোতে অনেকটা আমাদের দেশের মতোই মশলা ব্যবহার করে। তাই স্বাদও কিছুটা আমাদের দেশের খাবারগুলোর মতোই। আমরা এখান থেকে খেয়ে হোটেলে ফিরলাম কিছুক্ষন বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। আবার বেরোবো বিকালে নিউইয়র্ক শহরের আরেকটা জায়গা দেখতে। আমাদের লিবার্টি স্ট্যাচু এবং এলিস দ্বীপ ভ্রমণের কিছু ফটো দিলাম আমাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য।

স্ট্যাচু অফ লিবার্টি

লিবার্টি স্ট্যাচুর সামনে আমরা

লিবার্টি স্ট্যাচুর পাদবেদি

এলিস দ্বীপ

এলিস দ্বীপের বিখ্যাত Immigration Hall

লিবার্টি স্ট্যাচুর আদি মশাল

ম্যানহাটন থেকে লিবার্টি এবং এলিস দ্বীপ যাওয়ার cruise

হোটেলের রুম থেকে পাওয়া Hudson নদীর দৃশ্য